স্বর্গীয়া উমা দেবী

জন্ম— ৩০শে আগষ্ট, ১৯০৮ মৃত্যু ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

কাজলী

উমা দেবী

এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে
প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
২১, নন্দকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেনস্থ
কালিকা প্রেসে মুদ্রিত

“বাতায়ন”এর কবি স্বর্গীয়া উমা দেবীর এই উপন্যাসটি তাঁহার জীবিত কালে “বিচিত্রা” পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়; তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তমহাশয়ের উদ্যোগে ইহা এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৮

কাজলী

১

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঘনিয়ে এল। আকাশ অন্ধকার, খোলা জানালা দিয়ে অশান্ত পূবে বাতাস ঢুকে ঘরের জিনিষপত্রকে চঞ্চল ক'রে তুলেচে। মেঘনাদ একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে হাতের খবরের কাগজটা পড়বার চেষ্টা ক'রচেন, কিন্তু তাঁর কান অনতি-দূরে স্ত্রীর ঘরের দিকেই প'ড়ে আছে। কখন একটি শিশুর কান্না শোনা যাবে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে তা'রি অপেক্ষা ক'রচেন। সাত বৎসর পরে এই দ্বিতীয় সন্তান আসচে। মেঘনাদের স্ত্রী শৈল চিরদিনই ক্ষীণ দুর্ব্বল মানুষ, বড় মেয়ে বিজলীর জন্ম দিয়েই মাতৃত্বের গুরুভারে এম্‌নি নুয়ে প'ড়েচে যে, এতদিন পরে এই নূতন অতিথিটির আসবার সম্ভাবনা আনন্দের না হ'য়ে উদ্বেগের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। ডাক্তারবাবু একবার ঘর থেকে বেরোবামাত্র মেঘনাদ এগিয়ে এসে ব'ললেন, "কি খবর? আর কত

দেরী ?” বৃদ্ধ ডাক্তারের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো ; আশ্বাসের স্বরে ব’ললেন, “ব্যস্ত হবেন না, আপনার স্ত্রী বেশ শক্ত আছেন।”

মেঘনাদ আবার ব’ললেন, “বুঝেচেন তো ডাক্তার সরকার, ছেলে আমরা চাই না, কেবল আমার স্ত্রী যাতে—”

ডাক্তার বাধা দিয়ে ব’ললেন, “সবই ভালো হবে, মিস্‌টার চ্যাটার্জি, আপনি উতলা হবেন না !” তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে প’ড়লেন।

আরো দু’ঘণ্টা অসীম উদ্বেগে কেটে গেল। বহুক্ষণ স্ত্রীর ঘর থেকে কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে মেঘনাদ যখন মনে মনে অস্থির হ’য়ে উঠেচেন, ঘরে ঢুকলেন তাঁর বিধবা দিদি, যিনি এতক্ষণ শৈলর ঘর থেকে মুহূর্ত্তের জন্যে বের হ’তে পারেন নি ; ব’ললেন, “মেঘ, এইমাত্র আটটা-কুড়ি-মিনিটে তোর মেয়ে হয়েচে। ওরে লক্ষ্মী কোথায় গেলি, শাঁখটা বাজা না।”

মেঘনাদ ব্যস্ত হ’য়ে ব’ললেন, “শৈল কেমন আছে ?”

“বউ বড্ডই কষ্ট পেয়েচে ভাই, এখনো সাম্‌লে উঠতে পারেনি,—মেয়েটা কিন্তু খাসা সুন্দর হবে। বিজুর রং পায়নি, কিন্তু বউএর মত মুখ হবে বোধ হয় !”

“রক্ষে কর দিদি, রূপ-বর্ণনা রাখো, আমি কি ওঘরে যেতে পারি ?”

“একটু অপেক্ষা কর—আমি খবর পাঠাবো”। তিনি আবার ঘরের মধ্যে চ’লে গেলেন।

বৃষ্টি তখন জোরে প’ড়তে সুরু হয়েচে। নীচে বিজুর কলকণ্ঠ শোনা গেল, অর্দ্ধ-আলোকিত বারান্দা দিয়ে সে বাবার কাছে দৌড়ে এসে ব’ললো, “বাবা দাসী ব’লচে বোন এসেচে, চল দেখে আসি।”

মেঘনাদ ওকে কোলের উপর তুলে ব'ললেন, "দাঁড়া আগে একটা নাম ঠিক হোক্, নইলে ডাকবি কি ব'লে ?"

বিজু মহা উৎসাহে ব'ললে, "সে তো আগেই ঠিক আছে বাবা, বোন হ'লে কাজলী, ভাই হ'লে অর্জ্জুন। আচ্ছা বাবা, 'কাজলী' কি গরুর নাম ?"

"কেন ? কে ব'লেচে ?"

"মাষ্টার মশাই। তিনি বলেন শ্যামলী নাম ঢের ভাল।"

মেঘনাদ ওকে আদর ক'রে ব'ললেন, "না মা, কাজলী নামটিই সুন্দর। এই বর্ষার রাত্রে বিজলীর বোন কাজলীই তো পৃথিবীতে আসবে। চল আমরা কাজলীকে দেখে আসি, পিসিমা ডাকচেন।"

২

কাজলীর জন্মের আটদিন পরে শৈল মেঘনাদের হাত ধ'রে ব'ললে, "কোনো সাধই মিটল না, অথচ যাবার ডাক এসেচে।"

মেঘনাদ ভাল ক'রেই জানেন স্ত্রীর অবস্থা কতদূর সঙ্কটাপন্ন; সেপ্‌টিক্‌, তার সঙ্গে ১০৪।৫ জ্বর, দেহে রক্তও নেই, শক্তিও নেই, এই আটদিন ধ'রে যমে-মানুষে টানাটানি চলেচে। তবু স্ত্রীর ক্ষীণ হাতটি নিজের বুকের কাছে ধ'রে ব'ললেন, "না রাণি, তোমায় বাঁচতেই হবে, তোমায় বাঁচাবোই।"

শৈলর শীর্ণ করুণ মুখে হাসি ফুটে উঠলো; ব'ললে "ছোট খুকি কোথায়?"

"দিদির কোলে ঘুমুচ্ছে, আনবো?"

"না থাক্‌। আমি কি ভাবচি জান? আমি ম'রে গেলে তোমার যন্ত্রণার অবধি থাকবে না। বিজু বড় হয়েচে, কিন্তু ছোট খুকিটা এই তো সবে জন্মালো—ও হয়তো অনেকদিন বাঁচবে। পৃথিবীতে যে যত অসহায় সে তত দীর্ঘ আয়ু নিয়ে আসে, ওকে নিয়ে অনেক হাঙ্গাম পোয়াতে হবে। ভালই হ'ল, শৈল মুখপুড়িকে সহজে ভুলতে পারবে না।"

শৈল পরিহাস করতে ভালবাসতো, এই মরণের দুয়ারে পা বাড়িয়েও স্বামীকে একটু খোঁচা দিলে।

মেঘনাদ উত্তর দিলেন না; ম্লান হাসি হেসে ওর কপালে, রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। শৈল চোখ বুজে ভাবতে লাগলো, এত সুখ কার? কে ওর মত এমন অক্ষয় সৌভাগ্য

ফেলে রেখে অজানা পথে পাড়ি দেয়? ওর মত স্বামীর বুক-ঢালা ভালবাসা ক'টা নারীর ভাগ্যে জোটে? প্রাণের পুতুলি বিজলী —ছোট্ট অসহায় খুকু, সব ছেড়ে যেতে হবে। হায়রে! মায়ার সংসারে কি বন্ধন!

মেঘনাদের অগাধ অর্থব্যয়, অক্লান্ত সেবা, দশজন ডাক্তারের আনাগোনা, পরামর্শ, চিকিৎসা, ওষুধ, ইন্‌জেক্‌শন্‌, রক্তদান, সব ব্যর্থ ক'রে, কাজলীর জন্মের ঠিক একুশ দিন পরে, বর্ষার ঘনঘটার মধ্যে, সংসার-পথে এতদিনকার সুখদুঃখের সাথী, সহায়, সম্পদ, ভরসা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী শৈল—চির-আদরিণী শৈল—অনন্ত-পথে যাত্রা ক'রলে।

মেঘনাদের দিদি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। বিজলী কতক বুঝে, কতক না বুঝে, গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে লাগলো। লক্ষ্মীদাসী চোখের জল মুছে মা-হারা কাজলীকে কোলে নিয়ে ভোলাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রলে। কেবল মেঘনাদ শুষ্ক চোখে, অপলক দৃষ্টিতে শৈলর সুন্দর, অতি সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর যথাকর্ত্তব্য সবই সমাধা হ'ল—সংসার যথা-নিয়মে চ'লতে লাগলো।

৩

শৈলর মৃত্যুর পর আরো দীর্ঘ সাত বৎসর কেটে গেল। মেঘনাদের দিদি ছোট মেয়ের দোহাই দিয়ে ভাইকে আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রেছিলেন। মেঘনাদ গম্ভীর ভাবে ব'লেছিলেন, "কাজলকে মানুষ ক'রে তুলতে যদি তোমার কষ্ট হয় দিদি, আমি গভর্ণেস ও দুটো দাসী বেশী রাখতে রাজি আছি।"

দিদি আর দ্বিতীয় কথা বলেন নি। জন্ম থেকে মানুষ-করা ভাই-ঝি যে সন্তান-হীনা পিসিমার কতখানি, তা মেঘনাদও ভাল ক'রেই জানতেন।

কাজলীর জীবনে এই সাতটা বছর খুব বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্ত্তনশীল হ'লেও ইতিহাস অতি অল্পই। কথা ব'লতে শিখেই সে চাকর দাসীর মুখে শুনে পিসিমাকে "বড়মা' ডাকতে সুরু ক'রলে; বিজুর খেলার সাথী ও মেঘনাদের চোখের মণি হ'য়ে দাঁড়াল। ওর মুখের দিকে চেয়ে মেঘনাদ সমস্ত ভুলে যেতেন, এ যেন শৈলরই একটি ছোট ছবি, একটি শিশু সংস্করণ সেই স্নিগ্ধ শ্যামাভ গায়েব রং, ঘন-পক্ষ্ম-ঘেরা বড় বড় দুটি কাল চোখ, রেশমের মত চুলের গুচ্ছ, নিখুঁত নাক, আর গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত দুটি ঠোঁটে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য। ওর মুখের দিকে চেয়ে শৈলকে এ বাড়ীতে কেউ ভুলতে পারে না, ও যে শৈলর ধন একথা কাউকে ব'লে দিতে হয় না। বিজলীকেও কম সুন্দরী বলা যায় না; সে তার বাপ-পিসির মত সুন্দর রং ও জলজ্বলে চেহারা পেয়েচে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর রূপ রৌদ্রময়

দিনের মত প্রখর ও উজ্জ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। তাই তা'র পাশে পাশে কাজলীকে স্নিগ্ধ ছায়াখানির মত দেখাতো।

যেদিন মেঘনাদ বিজলীকে ডেকে ব'লেছিলেন, "বিজু, তুমি মায়ের ভালবাসা সাত বছর পেয়েচ, কিন্তু ছোট খুকু একমাসও পায়নি ; ওকে তুমি ভালবেসো, আমরা সকলে মিলে ওকে মায়ের দুঃখ ভুলিয়ে রাখবো—" বিজলী মাথা নেড়ে পরম বিজ্ঞ-ভাবে ব'লেছিল, "আমি তো ওকে খুব ভালবাসি।"

কাজল যেদিন দিদির আঁচল ধ'রে বেড়াতে শিখলো, 'দিদি' ব'লে ডাকতে সুরু ক'রল, বিজলীর সেদিন নবজন্ম যেন। সকলকে একথা বার বার ব'লেও তৃপ্তি পায়নি। মাষ্টার মশাই শুনে ব'লেছিলেন, "তোমার বোন যদি তোমায় খুব মারে, তুমি কি কর বিজলী?"

বিজলী তখনি জবাব দিয়েছিল, "আমার এমন মিষ্টি লাগবে মাষ্টার মশাই, ওকে আমি বুকে ক'রে চুমো খাব। কিন্তু ও তো মারতে শেখেনি, ও যে মা-মণির মত ভাল হয়েচে।"

মেঘনাদ প্রতিদিন আফিস থেকে এসে বিজলীর হাত ধ'রে কাজলীকে কোলে নিয়ে শৈলর ঘরে ঢুকতেন। সে ঘর তিনি আর ব্যবহার ক'রতে পারেন নি, কিন্তু ফুল দিয়ে সাজিয়ে ধূপের গন্ধ দিয়ে পূজোর ঘরের মত পবিত্র ক'রে রেখেছিলেন। মেয়েরা সে ঘরে জুতো খুলে ঢুকতো, ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা ব'লতো, দু'হাত জুড়ে মায়ের ছবিকে প্রণাম ক'রতো, আর প্রতিদিন-শোনা মায়ের গল্প রোজ নতুন ক'রে শুনতো।

৪

কাজলীর সাত বৎসরের জন্মদিন এল। ওর জন্মটা বাড়ীতে সুখের ব্যাপার নয় ব'লে, কখনো উৎসব হ'ত না। পিসি রাগ ক'রে ব'লতেন, "নাই বা হ'ল সুখের, তবু ওকে পেয়েছিলুম ব'লেই তো শৈলকে ভুলে থাকতে পেরেচি।" এবার বিজলী পিসিমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঐ দিন খুব একটা সমারোহ ক'রবে ঠিক ক'রলে। স্কুল থেকে এসেই বোনকে নিয়ে গেল ছাদে, ব'ললে, "জানিস কাজল, পরশু পাঁচুই আষাঢ় তোর জন্মদিন।"

কাজল বড় বড় চোখ তুলে ব'ললে, "জন্মদিন কাকে বলে দিদি?"

"ওমা কি বোকা তুই, তাও জানিসনে? যেদিন তুই জন্মেছিলি।"

এবার কাজল কতক বুঝতে পেরে ব'ললে, "সেই যখন মা স্বর্গে চ'লে গেলেন?" এ সব কথা শুনে শুনে ওর মুখস্থ।

বিজলী ব'ললে, "হ্যা ভাই, এবার জন্মদিনে আমরা খুব মজা করবো। আমার স্কুলের বন্ধুদের, মিহিরকে, প্রদীপকে, মালুকে, বুলটুকে, রুনুঁকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবো।"

কাজল মহাখুশী, হাততালি দিয়ে ব'ললে, "এক্ষনি কর, আজই কর"—ওর আর দেরী সয় না। দিদি বিজ্ঞের সুরে ব'ললে, "রোস্, আগে বাবাকে রাজি করি।"

বাবাকে রাজি করাতে দেরী হ'ল না। এই সাত বছর ধ'রে মেঘনাদ নিজের মনের সঙ্গে আর হারানো-স্ত্রী শৈলর সঙ্গে এমন

একটি সম্বন্ধ ক'রে নিয়েচেন যেখানে স্মৃতিতে বেদনা নেই, যেখানে তাকে হারাবার ভয় নেই, যেখানে সে আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ হ'য়ে অন্তরের অন্তঃস্থল আলোকিত ক'রে রেখেচে। তা'ছাড়া, দিদির কথায় কিছুদিন হ'ল তাঁর খেয়াল হয়েচে বিজলী বড় হচ্চে, ওর বিয়ে দিতে হবে—ওকে মানুষের সাম্‌নে বের ক'রতে হবে, দুই মেয়ে নিয়ে ঘরের কোণে বন্দী হ'য়ে থাকলে চ'লবে না। ও যে শৈলর বড় আদরের বিজু, ওকে মনোমত পাত্র খুঁজে সমর্পণ ক'রতে হবে। ব'ললেন, "বেশ তো মা, তবে এই সঙ্গে আমারও দু'চারজন বন্ধুকে বলি।"

বিজলী উৎসাহ পেয়ে ব'ললে, "সে বেশ হবে বাবা, তোমার বুড়ো বুড়ো বন্ধুদের জন্যে হলঘরের পাশের ঘরটা সাজিয়ে দেব। তাঁদের নামগুলো বল, চিঠি পাঠাবো।"

"এই তোর কালীকিঙ্কর জ্যাঠামশায়, আর তাঁর ছেলেমেয়ে; শশাঙ্ক আর তার ছেলে, আর পাশের বাড়ীর ভুবনবাবু।"

বিজলী ব'ললে, "শশাঙ্ক জ্যাঠার ছেলে মিহিরকে তো আগেই আমরা লিষ্টএ ধ'রেচি। ওর সঙ্গে যে আমাদের খুব ভাব হয়েচে।"

মেঘনাদ আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললেন, "কবে হ'ল?"

"ওমা, তুমি যে কি ভুলে যাও! শিবপুর বাগানে প্রথম দেখা হ'ল, মনে আছে? তারপর ওদের বাড়ী দু'দিন নেমন্তন্ন খেলুম, মিহির একদিন বেড়াতে এসেছিল, তবু বুঝি ভাব হবে না?"

মেঘনাদ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ব'ললেন, "নিশ্চয় মা, এতে যদি ভাব না হয় তবে তো অপরাধের কথা। কিন্তু বুড়ি, তুই সব পারবি তো? একসঙ্গে এত জনকে তো কখনো বলিসনি"

বিজলী ব'ললে, "খুব পারবো, পিসিমা সব দেখিয়ে দেবেন ব'লেচেন।"

মেঘনাদ নিশ্চিন্ত হ'য়ে বই খুলে ব'সলেন।

ভাঁড়ারের দালানে কাজল তখন বড়মার কাছে ব'সে তার ছোট ছোট চুলে বিনুনি বাঁধছিল। অনেক রকম আলোচনা ও গবেষণার পর কাজল ব'ললে, "বড়মা, তুমি যে শ্বশুরবাড়ী যাবার গল্প বল, দিদি যাবে না তো সেখানে?"

"ষাট, ষাট, যাবে বই কি ধন—শ্বশুরবাড়ী না গেলে হয়? দিদি যাবে, তুমি যাবে"—

"একসঙ্গে যাব?"

"আগে দিদি, তারপর তুমি। রাজপুত্তুর বর আসবে, বাঁশি বাজবে, আলো জ্ব'লবে, তারপর দিদিকে নিয়ে চ'লে যাবে।"

"আমিও দিদির সঙ্গে যাব।"

"তবে আমাদের কাছে কে থাকবে?" কাজল এবার মহা ভাবনায় প'ড়লো, ব'ললে—"কেউ যাবে না, সবাই থাকবে।" সম্প্রতি পিসিমা তাতে আপত্তি ক'রলেন না। চুল-বাঁধা শেষ হ'য়ে গেল, তিনি মনে মনে ব'ললেন, "বাছা আমার মায়ের স্নেহ জানে না, ওকে সংসারের ঝড় ঝাপ্টা থেকে কি ক'রে আগলে রাখবো?"

৫

সেদিন বাড়ীতে সত্যিই উৎসবের সাড়া প'ড়ে গেল। বহু-দিনকার বন্ধ-করা নীচের বসবার ঘরটার সব দরজা-জানালা খুলে বিজলী নিজের হাতে ঝাড়া-মোছা সুরু ক'রে দিলে। বালতি-বালতি জল ঢেলে, জানলা-দরজায় পর্দ্দা লাগিয়ে, ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে, ঘরটার একেবারে শ্রী ফিরিয়ে সে যখন রান্নাঘরে এল, তখন পিসিমা লক্ষ্মীদাসীর সাহায্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েচেন দেখলে।

কাজলী নিকটে ব'সে অনর্গল ব'কে যাচ্চে—ময়দার পুতুলও কয়েকটা বানিয়ে ফেলেচে।

পিসিমা ব'ললেন, "যা, যা বিজু, এবার কাপড়-চোপড় প'রে তৈরী হ'য়ে নে; কাজলকে তোল্ ওখান থেকে, ভাল ক'রে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দে, নিজেও একটু সাজ গে' দেখি, অমন সন্ন্যাসিনীর মত মূর্ত্তি ক'রে থাকিসনে। মায়ের তোরঙ্গ খুলে বেগুনী বেনারসীখানা আর দু'চারটে গয়না বের ক'রে পর "

বিজলী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো—ব'ললে, "আজ যদি অমন সংএর মত সাজি, স্কুলের মেয়েদের সাম্‌নে, মিহিরের সাম্‌নে, মুখ দেখাতে পারবো না, পিসিমা।"

পিসি তো অবাক্! "সাজলে আবার মুখ দেখানো যায় না নাকি? তোদের কালে বাছা সবই বিচ্ছিরি—তা তুই মিহিরকে নাম ধরে বলিস নাকি?"

বিজলী ঠোঁট উল্‌টে ব'ললে, "বলব না তো কি? আমার চাইতে মোটে পাঁচ-ছ' বছরের বড়—তা'কে দাদা ব'লতে হবে?"

পিসিমা আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবলেন এও বোধ হয় একালের ধারা, পাঁচ-ছয় বছরের বড়, সে বড় নয়! তবু আর কথা বাড়ালেন না, তাড়া দিয়ে দুই মেয়েকে সাজতে পাঠালেন।

বিজলী ছোট বোনকে মনের মত ক'রে সাজালে, তারপরে ওর কচি মুখখানিতে চুমু খেয়ে ব'ললে, "আজ তোকে এম্‌নি মিষ্টি দেখাচ্চে কাজল, যে দেখবে সেই আদর ক'রবে"—

কাজল ব'ললে "মিহির-দা ক'রবে?"

ওর ছোট্ট মনটি কখন্ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিল—মিহিরের কথা ব'ললে দিদি খুশী হয়। কিন্তু বিজলীর মুখটা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠলো—ওকে কোলের থেকে নামিয়ে দিয়ে ব'ললে, "যাও সোনা, গেটে দাঁড়িয়ে থাকো, কেউ এলেই সাম্‌নের ঘরে বসিয়ো।"

ছাড়া পেয়ে কাজল ছুটে পালালো। বিজলী নিজের সাজ-গোজটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও তাড়াতাড়ি সেরে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু কার্য্যগতিকে তা হ'য়ে উঠলো না। শাড়ী-নির্ব্বাচন আর হয় না, এটা-সেটা ঘেঁটে, কোনোটা প'রে কোনোটা না প'রে সবই অপছন্দ ক'রলে। শেষকালে একটা হাল্কা ফিরোজা রংএর শাড়ী মনোমত হ'ল—তার সঙ্গে একটা পান্নার দুল আর মুক্তোর হার প'রে তার ইন্দ্রাণীর মত রূপ শতগুণ বাড়িয়ে তুললে! সাজ শেষ ক'রে বড় আয়নায় নিজের সুন্দর মুখখানি আর একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে নীচে নেমে গেল!

সিঁড়ির নীচেই মিহিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। মিহিরের সঙ্গে মনে মনে তার যতই ভাব জমে উঠুক, কিন্তু সঙ্কোচ এখনো

ভাল ক'রে কাটেনি। বিশেষতঃ মিহির এতই লাজুক প্রকৃতির যে বিজলীকেই লজ্জা দূর ক'রে আলাপ ক'রতে হয়। ব'ললে, "তোমার বাবা আসেন নি বুঝি ?"

মিহির অপ্রস্তুত ভাবে ব'ললে, "আসবেন না কেন—-তোমার বাবার কাছে বসেচেন, তিনি আমাকে এই দিকেই পাঠিয়ে দিলেন।"

"বেশ করেচেন, তুমি কি বাইরের ছেলের মত ব'সবার ঘরে ব'সে থাকবে নাকি ? এসো আমার সঙ্গে কাজ ক'রবে—খাবারের প্লেট সাজানো বাকি"—ও সহজ হ'য়ে মিহিরকে সহজ ক'রে নিতে চায়, তবু মিহিরের লজ্জা কাটে না।

খাবার-ঘরের দিকে যেতে যেতে বিজলী ব'ললে, "কাজলকে দেখলে ? ওকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্চে, না ?" মিহির ভাবলে তার দিদিটিকেই বা কি কম ? কিন্তু কথাটা মনে হ'তেই ও নিজেই লাল হ'য়ে উঠলো, কেবলমাত্র হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলা হ'ল না।

নিমন্ত্রিতরা একে একে সবাই এসে প'ড়লেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার শেষ ক'রে গান বাজনা সুরু হ'ল। বিজলীর বন্ধু সবিতা যখন মিহি গলায় একটা হিন্দুস্থানী গান ধ'রলে, কালীকিঙ্কর বাবুর ছেলে, বিলেত থেকে সদ্য-আগত 'মিস্টার গাঙ্গুলী', ওরফে সুবোধ, বিজলীর সাম্‌নে গিয়ে করযোড়ে ব'ললে, "আপনার গান শোনবার সৌভাগ্য কি হবেনা, মিস্ চ্যাটার্জি ?"

বিজলী অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললে, "ছি, ছি, আমার আবার গান ?"

ওর বন্ধু কনক ওর কানের কাছে মুখ এনে ব'ললে, "ব'লনা, কি পুণ্য করেচেন যে, সে সৌভাগ্যের আশা করেন ?"

বিজলী ওর হাতে মৃদু চিম্‌টি কেটে সুবোধের পাশে ব'সে ইংরিজি গান সম্বন্ধে মতামত শুনতে লাগলো।

হল্‌ঘরের পাশের বারান্দায় প্রতিবেশী ভুবনবাবুর ছেলে প্রদীপ তখন কাজলকে ব'লচে, "কাজলি, আজ তোমায় এমন সুন্দর দেখাচ্চে"।

কাজল খুশী হ'য়ে বললে, "দিদি সাজিয়ে দিয়েচে।"

প্রদীপ ব'ললে, "আমি তোমায ফুলের তোড়াটা দিয়েচি ব'লে তুমি খুশী হয়েচ, কাজলি? ওটা আমি নিজের হাতে ফুল তুলে বেঁধেচি।"

কাজল দুঃখিত হ'য়ে ব'ললে, "তোমাদের বুঝি মালি নেই ভাই?"

"থাকলেও, তোমার জন্মদিনের তোড়া আমার নিজে বেঁধে দিতে ইচ্ছে ক'রলো"—হঠাৎ কাজলের মনে হ'ল, দিদি ব'লে দিয়েছিল কেউ কিছু দিলে 'খুশী হয়েচি' বলতে হয়। ও ব'ললে, "প্রদীপ, আমি খুব খুশী হয়েচি।"

প্রদীপের মুখটা হাসিতে ভ'রে গেল—"সত্যি খুশী হয়েচ? —ফুল পেলে তুমি আমারি মত খুশী হও বুঝি?"

কাজলী এবার একটু ভাবলে, তারপর ব'ললে, "আমি মনে করেছিলুম, তুমি কিছু দেবে না—তাই ফুল পেয়েই খুশী হয়েচি।"

ওর ছেলেমানুষীতে প্রদীপ হো হো ক'রে হেসে উঠলো—তেরো বছরের ছেলে ও, তবু কাজলীকে কত ছোট লাগে—এমন কচি; ওর বোন মালবীর চেয়েও কত ছেলেমানুষ; তাই তো ওকে এমন ভাল লাগে। ব'ললে "তুমি আমায় মালুর মত প্রদীপদাদা বল না কেন, কাজলী?"

"দিদি কেন বলে না দাদা? আমি শুধু মিহিরকে দাদা বলি, দিদি ব'লে দিয়েচে কিনা। ওই দেখ মিহিরদাও কি রকম দুঃখ-দুঃখ মুখ ক'রে ব'সে আছে। ওকে এই ফুলের তোড়াটা দিয়ে আসি, প্রদীপ।"

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ও ছুটে পালালো। প্রদীপ দুঃখিত হ'ল, কিন্তু রাগ ক'রলে না। কাজল সে তোড়াটা পেয়ে খুশী হ'য়েছিল, এতেই ওর মনটা ভ'রে গেল। এত অল্প বয়সেই ও কবিতা লিখতে সুরু ক'রেছিল। তাই ওর কবি-মনটি সদাই একটি মধুর ভাবুকতায় পূর্ণ হ'য়ে থাকতো—সামান্য ছোট্ট জিনিষকেও ও কল্পনা দিয়ে সুন্দর ক'রে দেখত।

মিহির একধারে গম্ভীর হ'য়ে ব'সেছিল, বিজলী এক ফাঁকে ওর কাছে গিয়ে ব'ললে, "কিছু কথা ব'লচ না কেন, মিহির?"

"আমার চুপ ক'রে সব দেখতে ভাল লাগচে।"

"কিন্তু কই দেখচ? অন্যমনস্ক হ'য়ে বসে আছ তো"—

"সব জিনিষ হয়তো দেখচি না—যা' চোখ এড়াবার নয়—তা' চোখ ভ'রে দেখচি।"

বিজলী হেসে ব'ললে, "উপস্থিত তো কালীকিঙ্কর বাবুর মেয়ে পারুলকে দেখচ।"

মিহির অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ললে, "পাগল নাকি! একটা গান ক'রবে বিজলী? বড় শুনতে ইচ্ছে ক'রচে"—

বিজলী উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে, "যদি করি, তবে ঐ মিস্‌টার গাঙ্গুলীর সবিনয়ে করজোড়ে অনুরোধেই গাইব, তোমার এ দায়সারা কথায় গাইব না জেনো।"

মিহির মলিন হাসি হেসে ব'ললে, "সেইজন্যেই তো একপাশে ব'সে আছি।"

মিস্‌টার গাঙ্গুলী ওদের এতক্ষণ কটাক্ষে দেখছিলেন, বিজলীকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সাম্‌নে এসে ব'ললেন, "আজ আমার ভারী আনন্দের দিন।"

বিজলীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। তিনি আবার বুঝিয়ে ব'ললেন, "বুঝতে পারচেন না? এমন সহজ, সপ্রতিভ সুন্দরী বাঙালী মেয়ে এই প্রথম দেখচি।"

বিজলী সুবোধের স্পষ্ট উক্তিতে লজ্জা বোধ ক'রলে, ব'ললে, "ওদের দেশের মেয়েরা বুঝি আপনাকে খুব মুগ্ধ করে, মিস্‌টার গাঙ্গুলী?"

মিস্‌টার গাঙ্গুলী একটি নিশ্বাস ফেলে ব'ললেন, "এদেশের সব মেয়েরা যদি আপনার মত হ'ত, মিস্ চ্যাটার্জি!"

এরকম ধরণের আলাপ বিজলী আর বেশী দূর অগ্রসর ক'রতে পারলে না—মৃদু হেসে পাশের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে বাবার বন্ধুদের পূরোদমে গল্প জমেচে। ও কালীকিঙ্করের কাছে গিয়ে ব'ললে, "ডাক্তারজ্যাঠা, পারুলের বিয়ে কবে দেবেন?"

কালীকিঙ্কর মনে মনে বিজলীকে ভারী স্নেহ করেন—সাধ আছে বউ ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে যান; ব'ললেন, "সুবোধের জন্যে একটি মেয়ে খুঁজচি—পেলে একসঙ্গে দু'ভাই-বোনের বিয়ে হবে।"

বিজলী আর কিছু ব'ললে না, সেখান থেকে বারন্দায় চ'লে গেল। মিহিরের শান্ত বিষণ্ণ মুখখানা দেখে ওর মনটা যে কেন এমন ভারী হ'য়ে উঠচে তা' ভেবে পেলে না।

কালীকিঙ্কর তখন বিজলীর কথার সূত্র ধ'রে মেঘনাদকে ব'লচেন, "মেঘনাদ, দাও না তোমার বিজলীকে আমি বউ করি। আমার ছেলেকে তো দেখচ? কিছু অমানান হবে না।"

মেঘনাদ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললেন, "সে তো বিজলীর সৌভাগ্য, কালীদা।"

৬

অতিথিরা চ'লে যেতেই পিসিমা ব'ললেন, "যাই বলিস্ মেঘ, আমার মিহির ছেলেটিকেই সব চেয়ে ভাল লাগে; কেমন ধীর-নম্র স্বভাব, বিজলীর সঙ্গে বেশ মানাবে।"

মেঘনাদ ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন, "ও সব কথা মনেও স্থান দিও না দিদি, ওর সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হবে না।"

"কেন রে? ওতো মন্দ ছেলে নয়, এবার বুঝি এম-এ দেবে, তা'ছাড়া শশাঙ্কের জমিদারীর আয়—"

মেঘনাদ বাধা দিয়ে ব'ললেন, "সে-সব আমি জানি দিদি, তবু কালী-দা'র ইচ্ছে বিজলী ওঁর পুত্রবধূ হয়; আমিও আপত্তি করিনি—"

"সে কি? কথা দিয়েচিস না কি?"

"ঠিক কথা নয়, তবে খানিকটা তাই। দিদি, অতীতের কথা একবার ভাবো, শৈলকে ভাল ক'রে তোলবার জন্যে কালী-দা'র সে কী প্রাণপণ চেষ্টা! তা'ছাড়া, আজ আমার এত টাকা, এত মান, এত প্রতিষ্ঠা, সবই যে কালীদা'র সাহায্যে গ'ড়ে উঠেচে তা' ভুলে যেও না। বিলেত গেলুম—কার টাকায়?"

পিসিমা হ্যাটকোটপরা সুবোধকে কিছুতেই বিজলীর জামাই রূপে কল্পনা করতে পারলেন না, তবু ভাইএর কথাও বুঝলেন; ব'ললেন, "যা' ভাল বুঝিস তাই করিস মেঘ, আমার আর কি বলবার আছে?"

সেদিন রাত্রে বিজলী কাজলের কানের কাছে মুখ এনে ব'ললে

"আজ যারা যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে সব চেয়ে কাকে ভাল লাগলো ব'লতো ?"

কাজল দ্বিরুক্তি না ক'রে ব'ললে, "কালী জ্যাঠামশায়কে—"

বিজলী অবাক হ'য়ে ব'ললে, "কেন ?"

"তিনি আমায় একটা পুতুল-খোকা, একটা কাঠের বাক্স, একটা চাবি-দেওয়া পাখী, আর চারটে ছবির বই দিয়েচেন।"

"ওঃ, তাই বুঝি ? আর মিহির তোকে কিছু দেয় নি ?"

"হ্যাঁ দিয়েচে—এক বাক্স চকোলেট।"

"তা হোক, তবুও সে-ই সব চেয়ে ভাল, বুঝেচিস্ ?"

কাজলী ব'ললে, "হুঁ।" বেচারীর চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল —আর কোনো কথা না ব'লে ঘুমিয়ে প'ড়লে।

বিজলীর কিন্তু অনেক রাত অবধি ঘুম এল না—সে শুয়ে শুয়ে সমস্ত সন্ধ্যার কথা ভাবতে লাগলো। কে কি ব'লেছিল, কে কি ক'রেছিল, সব নতুন ক'রে দেখলে, শুনলে। সর্ব্বশেষে এই ঠিক ক'রলে মিহিরই সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে ভাল; হোক না সুবোধের গায়ের রং ফসা, বিলিতি কায়দাগুলো খুব আশ্চর্য্যজনক দুরন্ত, তবু মিহিরের মত অমন ঢল্‌ঢলে দুটো ভাবে-ভরা চোখ নেই ত ? অমন ভয়ে-ভয়ে মিষ্টি ক'রে কথা বলে না ত ? ওকেই সব থেকে ভাল লাগে! ভাবতে ভাবতে কখন নিজের চোখ-দুটিও বন্ধ হ'য়ে এল।

৭

পরদিন সকালে চা খেতে ব'সে কাজল হঠাৎ ব'ললে, "বাবা, জান, কাল যত লোক এসেছিল তার মধ্যে মিহির সব চেয়ে ভালো।"

মেঘনাদ একবার বিজু ও একবার কাজলের দিকে চেয়ে ভাবার্থ গ্রহণ করবার চেষ্টা ক'রলেন। বিজলী বোনের নির্ব্বুদ্ধিতায় অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ব'ললে, "কেন ? তিনি তো তোকে মোটে এক বাক্স চকোলেট দিয়েচেন ?"

এ সাবধানতায় ফল কিন্তু বিপরীতই হ'ল ; কাজল ব'ললে, "কিন্তু তুমি যে কাল ব'লছিলে,. তবুও মিহিরদাদাই সব চেয়ে ভাল।"

এবার মেঘনাদ হো-হো করে হেসে উঠলেন। বিজলী মনে মনে ঠিক ক'রলে, এর পর থেকে কাজলকে আর কিছুই বলা হবে না, কি অসম্ভব বোকা মেয়ে ও !

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চ'লে গিয়ে সে ব'ললে, "পিসিমা, আজ আমি রাঁধবো।"

পিসি ব'ললেন, "থাক্ বাছা, প'ড়বি ত কালীকিঙ্কর সাহেবের বাড়ী। তারা তরকারীও কোটে না, রাঁধেও না ; দশটা খানসামা দিনরাত্তির ঘুরচে—খানা বানাচ্চে ; কি হবে মা, তোর হাত-পুড়িয়ে রান্না শিখে ?—হ্যাঁ, পড়তিস্ যদি ঐ মিহিরের হাতে তবে ঘরের লক্ষ্মী হ'য়ে যেতে হ'ত—শশাঙ্ক তো আজকালের লোকের মত নয়—"

বিজলী দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে শুনছিল কিন্তু আর পারলে

না—ব'লে উঠল, "এ সব কি ব'লচ পিসি, আমি ত কিছু বুঝতে পারচিনে ?"

ভাইএর জামাই-নির্ব্বাচন দেখে পিসির সত্যিই রাগ হ'য়েছিল, ব'ললেন, "বুঝবি আর কি, তোর বাপ সুবোধের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে ঠিক করেচে, বুড়ী পিসির শিক্ষাদীক্ষায় আর কুলোবে না।"

পিসিমা বোধ করি আরো কিছু ব'লতেন, কিন্তু বিজলী হঠাৎ উঠে চ'লে গেল।

মেঘনাদ চা-খাওয়া সেরে খবরের কাগজ হাতে ক'রে ভাবলেন, কাজলের কথা যদি সত্যিই হয়, তবে তো বিজুর মন জানা দরকার। মনে মনে ব'ললেন, আঃ, শৈল আমাকে কি অসহায়ই ক'রে গেছে! এ সব কি বাপের কাজ! ডেকে পাঠালেন বিজলীকে। সকালবেলা উঠেই বোনের বোকামি ও পিসিমার সখেদ উক্তিতে বিজলীর মন অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠেছিল; বাবা আবার নতুন কথা কি ব'লে ব'সবেন ভেবে ও মনটাকে শক্ত ক'রে নিলে যে কিছুতেই চঞ্চলতা প্রকাশ ক'রবে না।

মেঘনাদ ব'ললেন, "বিজু মা, আজ কালী-দা তোদের দুই বোনকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করেচেন, বৌঠাকরুণও আবার সকালে উঠেই ফোন্ ক'রে জানিয়েচেন। কাল তো তিনি মাথার যন্ত্রণায় আসতেই পারেন নি।"

বিজলী উৎসাহ দেখিয়ে ব'ললে, "বেশ তো বাবা, যাব—পারুলের সঙ্গে যে আমার খুব বন্ধুত্ব।"

মেঘনাদ ওর আগ্রহ দেখে নিশ্চিন্ত হ'লেন—মনে ভাবলেন, এখুনি আমি সাত-সতেরো কত ভেবে ম'রচি, কিন্তু মেয়ে তো আমার ঠিক আছে। ব'ললেন, "বেশ যেয়ো দুই বোনে।"

"আর ভাবচি মিহিরকেও একদিন নেমন্তন্ন ক'রব—শশাঙ্ক ওকে বিলেত পাঠাতে চায়, আমি কিছু পরামর্শ দেব।"

এবার আর বিজলী কিছু উত্তর দিলে না; ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে ব'ললে, "যাই, তোমার দুধটা নিয়ে আসি।"

দুই বোনে যথাসময়ে গাঙ্গুলীসাহেবের বাড়ী উপস্থিত হ'ল। বিজলীর মনে অস্বস্তির সীমা ছিল না, তবু যথেষ্ট সাহস ও মনের জোর ক'রে ও কাজলের হাত ধ'রে গাড়ী থেকে নামল। সুবোধ দরজাতেই অপেক্ষা ক'রছিল; ব'ললে, "বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়ে রেখেচেন, মিস্ চ্যাটার্জি; মনে মনে অধৈর্য্য হ'য়ে উঠছিলাম—"

পারুল এগিয়ে এসে ওকে হাত ধ'রে নিয়ে গেল, তারপর মাকে খবর দিতে চ'ললো।

বিজলী কাজলীকে নিয়ে একটা বড় কৌচে পাশাপাশি ব'সলে; সুবোধ পাখাটা আর একটু জোরে চালিয়ে মুখের সাম্‌নে আরো দুটো বাতি জ্বালিয়ে বিজলীকে ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত ক'রে তুললে।

মিসেস গাঙ্গুলী অথবা সুবর্ণলতা ঘরে এসে ঢুকলেন—বিজলী নত হ'য়ে প্রণাম ক'রলে। তিনি ওর চিবুক স্পর্শ ক'রে ব'ললেন, "আজকালকার মেয়ে তুমি, তবু তো সবই জানো মা! আমার পারুলকে প্রণাম ক'রতে ব'ললে সে নাক সিঁটুকে পালায়।"

বিজলী সলজ্জ ভাবে হাসলে, তারপর নিজের জায়গায় ব'সে সুবর্ণলতাকে ভাল ক'রে দেখতে লাগলো। বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে—অতিরিক্ত মোটা শরীর—সুগোল অথবা অতিগোল বাহুর উপরে ছোট-হাতের টাইট জামা ফেঁপে ফেঁপে ব'সেচে—পরনে একখানি ধূসর গরদ, তাতে ছাপার পাড়—মাথার সাম্‌নের পাতলা চুলগুলো দুটো ব্যাঁকা চিরুণী দিয়ে ফোলাবার ব্যর্থ চেষ্টা, পায়ে

'ফ্লেশ্-কলার' মোজার সঙ্গে হাই-হীল জুতো। কুশলপ্রশ্ন ও দু'চারটি কথার পর তিনি খাওয়ার আয়োজনে গেলেন। সুবোধের ছোট বোন কুন্দ এসে কাজলের হাত ধ'রে টানলে, "এসো না ভাই, আমার খেলা-ঘর দেখবে।"

দিদির অনুমতি পেয়ে কাজল চ'লে গেল। তারপর পারুল এল। বিজলীর কানে কানে ব'ললে, "কোনো বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে টেলিফোনে আমার একটি বিশেষ কথা বলবার আছে; কিছুক্ষণ ছুটি প্রার্থনা করি।" ছুটি মঞ্জুর হ'ল।

একে একে সকলের প্রস্থানের পর দেখা গেল, সুবোধ ভারী খুশী হ'য়ে উঠে কাজলীর শূন্য স্থানটা দখল ক'রে আলাপ জমাবার চেষ্টা ক'রচে। ব'লচে, "আপনার সেদিনকার গানটি কখনো ভুলব না, বিজলী দেবী; এখনো মাথার ভেতর ঘুরচে 'ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—।' বিজলী লজ্জিত হ'য়ে বললে "মনে রাখবার মত কিছুই গাইতে পারি নে—বাঙালী মেয়েদের গান তো বেশী শোনেন নি তাই হয় তো ভাল লাগে।" সুবোধ ব'ললে, "না, না, আপনি সত্যিই ভারী ভাল গান করেন, এ তো কেবল আমি একা ব'লচি না, সেদিন সকলেই একবাক্যে স্বীকার ক'রেচেন ঐ যে 'ইয়ং ম্যান্-টি'—কি নামটা মনে আসচে না—মিহির রায় বুঝি—উনিও গান শুনে ভারী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলেন—"

বিজলী অবাক হ'য়ে ব'ললে, "কেন?"

"কেন? এসব কি মুখে বলা যায় মিস্ চ্যাটার্জি, এ সব অনুভব করবার জিনিস। পুরুষের চঞ্চলতা কিন্তু যত অব্যক্ত থাকে ততই ভাল।"

বিজলী চুপ ক'রে রইল। সে বিরক্ত হচ্চে মনে ক'রে সুবোধ

প্রসঙ্গটা বদ্‌লে ফেললে ; ব'ললে, "দেখুন আপনাকে সেদিন যখন প্রথম দেখি, কি মনে হ'য়েছিল জানেন ? ঠিক যেন বিদ্যুতের মত আমার অন্ধকার জীবনে—"

বিজলী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে, "কাজল কই ?—ও নিশ্চয় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েচে, ও কারো সঙ্গে মিশতে পারে না।"

সুবোধ অগত্যা কাজলের খোঁজে গেল ; সেদিন আর অব্যক্ত বাণী বলবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

৯

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। অল্পক্ষণ আগে এক-পশলা বৃষ্টি হ'য়ে বাতাস ভিজে হ'য়ে আছে। বিজলী কাজলকে পিসিমার সঙ্গে ভুবনবাবুর বাড়ী খেলতে পাঠিয়ে দিয়েচে, কিন্তু নিজে কোনো কাজেই মন দিতে পারচে না, এস্রাজটা নিয়ে একটা হিন্দুস্থানী গান গাইবার চেষ্টা ক'রচে, এমন সময় অর্দ্ধ-আলোকিত ঘরে মানুষের ছায়া দেখা গেল। যে মানুষটি ঘরে ঢুকলে, তাকেই যে বিজলী এতক্ষণ মনে মনে চাইছিল তা' বুঝতে দেরী হ'ল না; বললে, "এসো মিহির, আমি মনে ক'রেছিলুম—ভুলেই গেছ বুঝি!"

"না ভুলিনি। ভুলতে যে পারি না তা' তুমি জান না?"

"কেমন ক'রে জানব? আমি কি গণক ঠাকুরুণ! কিন্তু হঠাৎ আজ কি ক'রে মনে প'ড়লো বল তো?"

"আমি বিলেত যাচ্চি, তাই বিদায় নিতে এসেচি—"

"ওঃ তাই বল! তোমার বাবা আপত্তি ক'রলেন না?"

"আমার উন্নতির পথে কেন তিনি বাধা দেবেন?"

"তবু, তুমি তাঁর এক ছেলে—সবেধন নীলমণি!"

মিহির কিছু ব'ললে না, কেবল একটু হাসলে। বিজলী আবার ব'ললে, "বেশ তো যাও, সুবোধবাবুর মত বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে নব নব 'আইডিয়া' ও কল্পনা ধারণ ক'রে সাহেব হ'য়ে এসো।"

মিহির ব'ললে, "তবু আমি জানি এই বিশেষ বাঙালী মেয়েটিই সেইরকম সাহেবের সঙ্গে ভাব করতে দেরী করেন নি।"

"কেন ক'রব না? কাজুর জন্মদিনের পর তাঁর সঙ্গে আমার তিনবার দেখা হয়েচে; এই যে টেবিলে ফুল দেখচ এ তাঁরই দেওয়া! আর তুমি এতদিন পরে আজ বিদায় নিতে এলে।"

"আমি যে কেন দূরে দূরে থাকি সে তুমি বুঝবে না, বিজলী!"

বিজলী উত্তেজিত হ'য়ে ব'ললে, "বুঝব না? বেশ ভাল কথা, আমার বুদ্ধি-সম্বন্ধে যে তোমার এতখানি জ্ঞান হ'য়েচে তার জন্যেও ধন্যবাদ! কবে যাচ্চ বিলেত? আজ রাত্রেই?"

শান্ত ভাবে মিহির ব'ললে "না, আগামী সোমবার,—আরো ছ'দিন দেরী আছে।"

বিজলী হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো, ঘরের সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে বন্ধ দরজাগুলো খুলে ফেলে ওর সামনে এগিয়ে এসে ব'ললে—"জান, সুবোধ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্চে?"

তবু অপর পক্ষে কোনো উত্তেজনা দেখা গেল না, উত্তর দিলে, "শুনে খুশী হ'লুম বিজলী! তিনি তোমার যোগ্যপাত্র সন্দেহ নেই।"

বিজলী জ্ব'লে উঠলো, ও মনে ক'রেছিল এই বিয়ের কথা শুনলে মিহির স্থির থাকতে পারবে না, ওর নির্ব্বিকার চিত্ত দুলে উঠবে—ও যদি একবার বলে "বিজলী, তোমাকে আমি ভালবাসি"—তবেই তো সব সহজ হ'য়ে যায়। কিন্তু এ তো ব'লবে না কিছু, এ যে ভালবাসে না—হয়তো ভালবাসতে জানেও না—কেবল নিজের ভাবুকতা আর বিদ্যের অহঙ্কার নিয়ে আছে। স্বার্থপর অবুঝ পুরুষ! বিজলীর ইচ্ছে হ'ল—উঠে যায়, খুব খানিকটা কাঁদে—নিজের মনের সঙ্গে খুব একটা বিদ্রোহ লাগিয়ে দেয়।

কতক্ষণ কেটে গেল, মিহির ব'ললে, "এবার আমি যাই তা হ'লে, আবার বৃষ্টি আসবে।"

বিজলী ব'ললে, "আমি তো তোমায় ধ'রে রাখিনি, মিহির!"

"তুমি কি আমার উপর রাগ ক'রেচ বিজলী?"

"রাগ?—কই, না।"

মনে মনে ব'ললে, তুমি কি বুঝবে রাগ আর অনুরাগের কথা? তুমি তো পাথরের মত কঠিন, মাটির মত প্রাণহীন, লেখাপড়া-জানা সুবোধ বালক!

হাওয়া বন্ধ হ'য়ে গিয়ে ঘরে-বাইরে গুমোট অসহনীয় ক'রে তুলেচে; মিহির ব'ললে, "চল বিজলী, সামনের ছাতটায় যাই।"

"তুমি যাও, আমি পরে যাচ্চি।"

মিহির চ'লে গেলে বিজলীর বাধাহীন অশ্রু ঝরে প'ড়লো—জমাট কান্না এতক্ষণ তার বুকে বেধেছিল। ভাবলে, মেয়েরা কী অসহায়—কী পরাধীন! ইচ্ছে করে ওকে নাড়া দিয়ে ওর মনের বীণার তার ঠিক সুরে বেঁধে দিই, কিন্তু কিছুতেই পারবো না ওকে ব'লতে—ও কেন নিজে কিছু বোঝে না! ছাতে এসে পাঁচিলের গায়ে মাথা দিয়ে যখন দাঁড়ালে, তখনো ওর মন স্থির হয়নি। মিহির ওর খুব কাছে এল; ব'ললে, "বিজু, আমায় ভুল বুঝোনা; আমার কথা কাউকে বলবার নয়।"

ও ধীরে ধীরে বিজলীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে—অশ্রু আর গোপন রইল না, অঝোরে ঝ'রে প'ড়লো মিহিরের বাহুর উপরে।

গলার সুর আরো কোমল ক'রে মিহির ব'ললে, "তুমি দুঃখ ক'রোনা বিজলী, তুমি আমার বন্ধু, শুধু এই অধিকারটুকু দিও।"

হায়রে! যাকে রাজত্ব দিতে পারে সে চায় মুষ্টিভিক্ষা! বিজলীর এত দুঃখেও হাসি এল।

কাজলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রদীপ বিজলীকে ডাক দিয়ে

ব'ললে, "বিজলী দি, আমার মাষ্টার এসেচে, আমি চল্লুম, কাজল এই রইল!" ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। মিহির কাজলকে ডাকলে, ও দৌড়ে ছাদে এল—একবার দিদির মুখে একবার মিহিরের মুখে অবাক্ হ'য়ে চাইলে। মিহির ওকে বুকের কাছে টেনে ব'ললে, "কাজল—"

কাজল ওর গলা জড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'ললে, "মিহির দা, তুমি খুব ভাল।"

তারপরে তিনজনে নির্ব্বাক হ'য়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলো— মেঘ কেটে গিয়ে হঠাৎ দমকা বাতাস উঠলো—ভিজে মাটি আর যুঁই ফুলের গন্ধ ভেসে এল—তার পরই মেঘনাদের গাড়ীর হর্ণ শুনতে পাওয়া গেল।

১০

পরদিন বিজলী অসুখের ছল ক'রে নিজের ঘরে বন্দী হ'য়ে রইল। সে একলা থাকতে চায়—নিজের মনের সঙ্গে খুব একটা বিরোধ বাধাতে চায়। বহুক্ষণ মনের সঙ্গে যুক্তিতর্ক ক'রেও যখন হার মানাতে পারলে না, তখন বালিসে মুখ গুঁজে কান্না সুরু ক'রে দিলে।

সন্ধ্যার কিছু আগে দাসী ঘরে একখানা চিঠি রেখে গেল, মনের আলস্যে বিজলী চেয়ে দেখলে না। কিন্তু অন্যমনস্ক চোখ গিয়ে প'ড়লো তার উপরে—এতো মিহিরের হাতের লেখা! ত্বরিতে সে চিঠিখানি খুলে ফেলে, জানলার কাছে ব'সে সন্ধ্যার ম্লান আলোকে প'ড়লে। প্রত্যেকটি অক্ষর ওর বুকে বেদনার বাণ হ'য়ে এসে বিঁধলো। মিহির লিখেচে—

বিজলী,

যেদিন শিবপুর বাগানে তোমাকে প্রথম দেখি, সেদিনই রাত্রে বাবা আমায় ডেকে ব'ললেন, আমি বাগদত্ত। আমি যখন ছ' বছরের, বাবার বন্ধুকন্যা যখন মাত্র এক বছরের, তখন থেকে তার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক। সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌বার নয়।

জীবনে প্রথম যেদিন কোনো মেয়েকে দেখে ভাল লাগলো—সেদিনই এই নিদারুণ বাণী শুনলুম। তুমি জান, বাবা আমায় কত ভালবাসেন, আমি ছাড়া তাঁর কেউ নেই, তাই নিজের মনে যতই দুঃসহ ব্যথা জাগুক, তাঁকে কষ্ট দিতে পারবো না। জীবনে যিনি কখনো অন্যায় করেন নি, তাঁর একমাত্র পুত্র তাঁকে সত্যভঙ্গের

অপরাধে অপরাধী ক'রতে পারবে না। আমি আমার ভাবী বধূকে কখনো দেখিনি—জানিনা সে কেমন—তবু সে যে আমারই অপেক্ষায় ব'সে আছে এ কথা ভুলে গেলে চ'লবে না। বিবাহ এইমাসে হবার কথা ছিল, কিন্তু সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—ফিরে এলে হবে।

বিজলী, তুমি ত বুদ্ধিমতী—তুমি ত সমস্তই বুঝতে পারবে—ক্ষণিকের অতিথিকে ভুলে যেও। তুমি সুখী হও। আমার দ্বারা তুমি যদি অশান্তি পাও—তবে যে আমার দুঃখের অবধি থাকবে না। নিজের কথা আজো কিছু ব'ললাম না—সে আমার মনের গোপন কোণেই লুকোনো থাক্।

মিহির

বিজলীর কাছে সমস্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো—কেন যে মিহির এত কাছে এসেও এত দূরে দূরে ছিল তা' এতদিনে বুঝতে পারলে। মনে মনে ব'ললে—তুমি সুখী হও—আমার জন্যে তোমাকে অপরাধী ক'রব না। আমি ভুলে যেতে পারব কি না জানিনে—কিন্তু তোমাকে ভুলে যেতে দেব। তোমার কাছ থেকে পাবার আর কিচ্ছু নেই; সুধু তুমি ভাল থেক'। তক্ষুণি জবাব লিখে পাঠালে—

মিহির,

তুমি সুখী হও। আমার শুভকামনা তোমার সঙ্গে রইল।

১১

আরো পাঁচ-ছয় বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল কিন্তু এর ইতিহাস বড় অল্প নয়।

শশাঙ্কবাবু হঠাৎ কলেরায় মারা গেছেন। মিহিরের আর দ্বিতীয় আত্মীয়-বন্ধু না থাকায় মেঘনাদকেই এই নিদারুণ সংবাদ পাঠাতে হ'ল। উত্তরে মিহির লিখলে—

কাকা,

বাবা নেই, সংসার আমার কাছে শূন্য হ'য়ে গেছে—কিসের জন্যে কার কাছেই বা ফিরবো? যতদিন শিক্ষার মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে, নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারি তবু একটা আশ্রয় আছে। আপনি বাবার জমিদারীটি অনুগ্রহ ক'রে দেখবেন। বিজলী ও কাজলীকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

প্রণত মিহির

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সুবোধের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হ'য়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে নিতান্ত সহজে হয়নি সেই গোড়ার কথাটা আগে বলি।

বিজলী মিহিরের সম্বন্ধে মনে কোনো চঞ্চলতা না থাকতে দিলেও তাকে ভুলতে পারছিল না। তার তরুণ জীবনের প্রথম ভালবাসা যাকে সে নিবেদন করেচে, সে তো উৎসর্গিত ফুল, তা' আবার ফিরিয়ে নেয় কেমন ক'রে?

তাই সুবোধের বার-বার সরব ও নীরব ভালবাসার নিবেদন

সে প্রত্যাখ্যান ক'রলে। এমন কি কালীকিঙ্কর যখন ছেলের হ'য়ে অনুরোধ ক'রতে এলেন, ও মুখ ঘুরিয়ে ব'সে রইল—কথার জবাব দিলে না।

মেঘনাদ জোর ক'রলেন না, বাধা দিলেন না; ব'ললেন, "ওর তরী যদি স্রোতের মুখে ভেসে থাকে কালীদা, তাকে তীরে টেনে রাখবার চেষ্টা করা মিথ্যে।"

ফলে কালীকিঙ্করের সঙ্গে মেঘনাদের একটা চিরস্থায়ী মনো-মালিন্য বেধে গিয়ে মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হ'ল।

তবু এ অবস্থায় বছর-কতক কাটলো, আরো কেটে যেতে পারতো, যদি না মেঘনাদ প'ড়তেন কঠিন ব্যারামে। দুরারোগ্য স্নায়বিক অবসন্নতায় তাঁর জীবনের আশা লুপ্ত হ'য়ে এল। বিজলী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখলে, দুই কন্যার অসহায় অবস্থা কল্পনা ক'রে মেঘনাদ আরো বিচলিত হ'য়ে প'ড়লেন। শেষে একদিন বিজলীকে ডেকে ব'ললেন, "মা, কালী-দা'র ওষুধ না হ'লে আমার রোগ সারবে না, তাঁকে কি ডাকবার কোনও উপায়ই নেই?"

বিজলী চম্‌কে উঠলো। উপায় তো তারই হাতে—সে যদি আজ সুবোধকে বিয়ে করতে রাজী হয়, তবে কি কালীকিঙ্কর না এসে পারবেন?

বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে ব'ললে, "বাবা, আমি তাঁকে আনবার বন্দোবস্ত ক'রচি।" তারপর নিজের ঘরে উপস্থিত হ'ল।

মিহিরের বিলেত থেকে লেখা কয়েকখানি চিঠি যা' সে বহুযত্নে কৃপণের ধনের মত তুলে রেখেছিল, বাক্স থেকে বার ক'রে

বারম্বার প'ড়লে। তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে একটির পর একটি চিঠি তারই শিখার মুখে ধ'রে পোড়াতে পোড়াতে অনুচ্চস্বরে ব'ললে, "তোমাকে ভুলব, তোমাকে ভুলব, তোমাকে ভুলব। তুমি আমার কেউ নও, কেউ কোনোদিন ছিলে না। আজ হ'তে আমি মুক্ত,—আমার মনের কোণেও তোমার স্থান নেই!"

সোফারকে দিয়ে গাড়ী বা'র করিয়ে বিজলী একেবারে কালী-কিঙ্করের দরজায় উপস্থিত হ'ল। কালীকিঙ্কর তক্ষুণি বেরোচ্ছি-লেন, দরজাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা। বিজলী তাঁর দুই পায়ের উপর প'ড়ে ব'ললে, "জ্যাঠামশায় চলুন, বাবাকে একবার দেখতে চলুন বাবার খুব অসুখ,—আপনি না গেলে তাঁকে বাঁচাতে পারা যাবে না!"

বিষম মর্ম্মাহত হ'য়ে কালীকিঙ্কর ব'ললেন, "মেঘনাদের এত অসুখ আর আমি যাব না? আজ পাঁচ বচ্ছর তাকে না দেখে কত কষ্টে আছি তা তুমি কি বুঝবে, বিজু! একটু অপেক্ষা কর মা, আমি দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে এসে মেঘনাদের অসুখের কথা শুনচি।"

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ ক'রে বিজলী একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়লো। পাশের ঘর থেকে সুবোধ সব কথা শুনতে পেয়েছিল, কালীকিঙ্কর প্রস্থান ক'রলে সে এসে উপস্থিত হ'ল। তাকে দেখে বিজলীর মুখটা একবার পাংশু হ'য়ে আবার লাল হ'য়ে গেল। জড়িতস্বরে সে ব'ললে, "সুবোধ বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন।"

সুবোধ স্নিগ্ধকণ্ঠে ব'ললে, "তোমার সঙ্গে বাবার যা কথা হ'ল আমি সব শুনেচি। তুমিও আমাকে ক্ষমা কর, বিজলী! তুমি

উপেক্ষা ক'রেছিলে ব'লে সেই অপমানে বাবাকে তোমাদের বাড়ী যেতে দিই নি, আজ সেই অপরাধ আমার লাগলো !"

বিজলী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললে, "অপরাধ সমস্তই আমার, তবুও কি আমাকে গ্রহণ ক'রতে পারবেন ?"

সুবোধের মনে আজো বিজলীর মূর্ত্তি অক্ষয় হ'য়ে রয়েচে—তাকে ভুল্‌তে পারে নি ব'লে সে বিবাহও করে নি। তবু ব'ললে, "ধরা দিতে এসেচ—? কিন্তু তুমি তো আমায় ভালবাসো না, বিজলী !"

"আমি চেষ্টা ক'রব। আমাদের বিয়ে হ'লে বাবা খুশী হবেন, সেরে উঠবেন, এই আমার বিশ্বাস।"

সুবোধ তখন সমস্ত কায়দা, সমস্ত অভিমান ভুলে নত হ'য়ে ব'সে ব'ললে, "তোমার ভালবাসা আমি পাব—এ আমারও বিশ্বাস। আমি মলিন, আমি কালো—কিন্তু তোমার স্পর্শে আমার যা' কিছু সব আলো হ'য়ে উঠবে—এ আমি নিশ্চয় ব'লতে পারি।"

১২

কালী-দা'র সঙ্গে মিলন—বিজলীর বিয়ের ঠিক—ভাল ডাক্তারের ওষুধ—এই সব ক'টিই মেঘনাদকে বেঁচে ওঠার পথে টেনে নিয়ে চ'ললো। বহুদিন পরে তাঁর শীর্ণ মুখে হাসির রেখা দেখা দিলে। বিজলীর পিঠে হাত বুলিয়ে ব'ললেন, "মা, আমি জানি তুই সুখী হবি—তুই আর মনে কোনো 'কিন্তু' রাখিসনে। তুই যখন খুব ছোট, শৈলর সাধ ছিল কালীদা'র ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়; আজ মায়ের আশীর্ব্বাদ তোর ওপরে রয়েচে, একথা ভুলে যাসনি।"

মেঘনাদ সেরে উঠলেন, ফাল্গুনের এক গোধূলি-লগ্নে বিয়ে ঠিক হ'ল। বিজলীর ভাবনা—কাজলকে ও কেমন ক'রে ছেড়ে থাকবে? কাজল বড় হয়েচে—এখন আর সে যখন-তখন এসে আবদার করে না, ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে না, তবু বিজলী ভাবে ও বড় ছেলেমানুষ—ওকে কে বুঝাবে? ওর মনটি যে এখনো ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যার মত ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু বিজলী ওর বোনটিকে যতই ছোট ভাবুক, ভিতরে ভিতরে সে অনেকখানি বড় হ'য়ে উঠেচে—তার শান্ত স্বভাব, সংযত ব্যবহার ও অকারণ-ভাবনা-ভরা মন দেখলে কেউ আর ওকে ছোট ভাবতে পারে না। কোন কিছুতেই সে অধীর হয় না, এক দিদি ছাড়া কারো কাছেই কিছু ব'লতে চায় না। বিজলী ছোট বোনটিকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে, "কাজ্‌লি, তোর কি দুঃখ ব'লেও কিছু নেই? আমি চ'লে যাচ্চি, তবু তুই একটু কাঁদলিনে পর্য্যন্ত?"

কাজলের চোখের কূলে কূলে জল ভ'রে এল, ব'ললে, "আমি

যদি দুঃখ পাই সে তো আমারই দুঃখ দিদি! সে কি কাউকে বলবার? কাউকে দেখাবার?"

বিজলী ভাবনায় মরে, এই চাপা সংযত মেয়েটা—একে কার কাছে রেখে যাবে?

বিয়ের দিন কাজলী সমস্তক্ষণ দিদির পাশে পাশে ঘুরলে—যেন দিদিকে ওর কালো চোখের ছায়ার মধ্যে ধ'রে রেখে দেবে—যেন ওকে হারাবার ভয় নেই।

সন্ধ্যা হ'য়ে এল—মিলনের সুরে নহবৎ বাজ্‌ছিলো, পিসিমা একবার রান্নাবাড়ী একবার নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা ক'রে ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরছিলেন। বধূবেশে সজ্জিতা বিজলী এক পাশে ব'সে-ছিল—কাজল তার কাছে গিয়ে বস'লে। বহুক্ষণ দিদির মুখের দিকে চেয়ে রইল—চোখের পাতাও যেন প'ড়লো না। নিমন্ত্রিতদের ভেতর তখন মৃদু গুঞ্জনে কথা চ'লছিল। কেউ ব'লছিল, "দেখেছিস্ ওর চোখে কি রকম সর্ব্বহারা ভাব?" কেউ বা ব'লছিল, "মাথা বোধ হয় খারাপ হ'য়ে যাবে—আহা দিদি-অন্ত প্রাণ!" কেউ সংশোধন ক'রে ব'লছিল, "কবিতে লেখে, কবিতে—তাই অমন দৃষ্টি!"

কাজল উঠে গেল আস্তে আস্তে—ওদের শোবার ঘরের পিছনে যে একটু কোণ-বের-করা বারান্দা, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। দিদির হাতে-পোঁতা টবের গাছে আধ-ফুটন্ত বেল আর জুঁই যেন পরম বন্ধুর মত ওর মুখের দিকে চাইলে। সন্ধ্যে হ'য়ে আসছিল; এখুনি হয় তো বর এসে প'ড়বে—গোলমালে কাজলের যেতেও ইচ্ছে করে না, না গিয়েও পারে না—এমন সময় কে এসে ওর চোখ টিপে ধরলে।

কোনো নামই যখন মনে এল না, তখন হাত ছেড়ে প্রদীপ সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। ছেলেবেলায় প্রদীপ ওর খেলার সাথী ছিল, কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজল নিজেকে সবার কাছ হ'তে দূরে রাখতে চাইত—সহজে কেউ ওর কাছে আসতে সাহস পেত না। কতদিন কাজল দেখেচে, প্রদীপ ওদের বাড়ীর জানলায় সকরুণ দুটি চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে ; ইচ্ছে হয়েচে—ওকে ডেকে দুটো কথা বলে ; কিন্তু মনের ভেতর তেমন তাগিদ জাগেনি তাই আস্তে আস্তে দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে গেছে। ওর বোন মালবীর কাছে শুনেছিল, প্রদীপ ওর নামে কবিতা লেখে ; শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভেবেচে, আমার কথা ও মনে রাখে কেন ? আমি তো ওকে একটুও চাইনে। সেই প্রদীপ আজ বিয়ে-বাড়ীর সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েচে। ব'ললে, "কাজলি ?"

"কি প্রদীপ ?"

"তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না কেন ?" ছোট বেলার মত অভিমান ক'রে ও ব'ললে।

কাজল উত্তর দিলে, "কি কথা কইব ? তুমি আমার খেলার সাথী ছিলে—খেলার দিন এখন গেছে, তাই তোমাকে ডাকবার কথা আমার মনে আসে না।"

প্রদীপ ব্যথা পেয়ে ব'ললে, "তবু আমার ইচ্ছে করে আবার আমরা বন্ধু হই—খেলার দিন যদি আর নাই থাকে, দু'জনে একসঙ্গে পড়াশুনো তো ক'রতে পারি।"

কাজল জানে প্রদীপের সাহিত্যের ওপর কত অনুরাগ— একটি ভাল কবিতা নিয়ে ও মত্ত হ'য়ে থাকতে পারে। বললে, "বেশ ত

প্রদীপ, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমায় প'ড়ে শুনিয়ো। দিদি চ'লে গেলে একা প'ড়ব—তুমি এলে ভাল লাগবে।"

প্রদীপ শিশুর মত খুশী হ'য়ে উঠে ব'ললে, "আজকের এই মুহূর্ত্তটি কখনো ভুলব না কাজলী, আর কিছু ব'লে এর মাধুর্য্য নষ্ট ক'রব না।"—ও চলে গেল।

কাজলের আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগল না—সে আবার এল দিদির কাছে। ঘর শূন্য—সকলেই বর আসবার সম্ভাবনায় ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েচে, কেবল বিজলী নত হ'য়ে পিঁড়ির ওপর ব'সে আছে। কাজলীর শুক্‌নো মুখ দেখে বিজলী ব'ললে, "ভাল লাগচে না ?"

"সত্যিই ভাল লাগচে না দিদি, ইচ্ছে হচ্চে খুব কাঁদি এবার।"

বিজলী ওকে আদর ক'রে ব'ললে, "তোর জামাইবাবু নিশ্চয় তোকে ঐ বাড়ীতে নিয়ে যাবেন।"

কাজল মাথা নেড়ে ব'ললে, "সে আমি যাব না দিদি। বাবা একা প'ড়বেন। বড়মা বুড়ো হয়েচেন, কিছু কাজ ক'রতে পারেন না—বাবাকে কে দেখবে ?"

'তাও তো বটে'—বিজলী যেন কোথাও কূল পায় না।

"কাজল, তোর মিহিরকে মনে আছে ?"

"ভালো মনে নেই—তবু ভুলে যাইনি দিদি, বাবার ঘরে যে ছবিটা আছে দেখলে মাঝে মাঝে মনে পড়ে।"

"তাকে তুই আমার বিয়ের খবরটা দিবি, কাজল ?"

"আমার লজ্জা করে, বাবাকে ব'লব।"

"আচ্ছা তাই বলিস, কিন্তু লজ্জা কি ভাই, ও তো তোর দাদার মত।"

বাইরে কলরব উঠলো—ঘন ঘন শাঁখের শব্দ জানিয়ে দিলে বর এসে পৌঁছেচে কাজলী বর-বেশী সুবোধকে দেখবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেল

১৩

বিজলী চ'লে যাবার পর কাজল মেঘনাদের সেবায় সমস্ত মন অর্পণ ক'রলে। বিজলীর অভাব সে বাবাকে কিছুতেই জানতে দেবে না এই তার পণ।

মেঘনাদ বিজুর বাড়ী গিয়ে বলেন, "ও যে কী মেয়ে হয়েচে মা, দিনরাত্তির আমায় সাম্‌লে বেড়ায়—"

বিজলী চোখের জল মুছে ব'লল, "আহা, তাই যেন পারে—তোমার সেবায় আমার কথা যেন ভুলে থাকতে পারে। এখানে এত আদর ভালবাসা—তবু ওর কাছেই আমার সমস্ত মন প'ড়ে থাকে।"

কাজল দেখলে বাবার নষ্টস্বাস্থ্য ক'লকাতায় ফিরবে না। বড়মা'র কাছে গিয়ে ব'ললে, "বাবাকে দিদিদের সঙ্গে দারজিলিং পাঠিয়ে দিই বড়মা ?"

"বেশ তো তোরা দুজনে বেড়িয়ে আয়—আমিও একটু আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ থেকে ঘুরে আসি; শৈল যাবার পর অবসর তো আমার হয়নি—কতকাল যাইনি তার ঠিক নেই।"

"বাবা দিদিদের সঙ্গে যান, আমি তোমার সঙ্গে যাব বড়মা !"

"সে কি কথা বাছা ? সে কি যাবার জায়গা যে যাবি ? গণ্ডগ্রাম তোরা জন্মেও তেমন দেখিসনি—"

"সেইজন্যেই তো দেখতে ইচ্ছে করে; দারজিলিং-এ দুবার গিয়েচি, আরো হয়তো কতবার যাব—কিন্তু পাড়াগাঁ দেখা কি রোজ রোজ ঘটবে ?"

অগত্যা পিসি রাজী হ'লেন, কিন্তু ব'ললেন, "যা না মেঘকে গিয়ে বল্—ক্ষেপে উঠবে।"

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মেঘনাদ কিছু ক্ষেপলেন না—এক কথায় রাজী হ'লেন। তিনি তাঁর ছোট মেয়েটিকে ভাল ক'রেই জানতেন—পর্ব্বতের মত দৃঢ় ওর সংকল্প।

ও বেশী কথা বলে না—কিন্তু নিজের মতও ছাড়ে না। ব'ললেন, "বেশ মা, যা, ক'দিন ঘুরে আয়—ভাল যদি না লাগে তা হ'লেই চলে আসিস, কেউ তো ধরে রাখবে না?"

কিন্তু বিজলীকে রাজী করাই মুস্কিল হ'ল—সে কেঁদে কেটে অনর্থ ক'রলে। কাজল ওকে চুপি চুপি ব'ললে, "আমি বড়মা'র কাছে শুনেচি তোর খোকা হবে—এখন বোনের ভাবনা অত ভাবতে হবে না।"

বিজলীর সুন্দর মুখখানা নবমাতৃত্বের কল্পনায় ভ'রে উঠলো—তবু তর্ক ক'রতেও ছাড়লে না। অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে ব'ললে, "তবে শপথ ক'রে বল্, ঠিক পনেরো দিন পরে চ'লে আসবি, আমি ওঁকে পাঠিয়ে দেব।"

'আচ্ছা' ব'লে কাজল রেহাই পেলে। তখন আর অপর পক্ষের কিছুই বলবার রইল না—চোখের জল মুছে বাক্স গুছোতে গেল।

১৪

মেঘনাদ বিজলীদের সঙ্গে যখন রওনা হ'য়ে গেলেন, তখন কাজলের আর কোনো কাজ রইল না। বাপের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ সে নিজে হাতে ক'রত, এখন অনন্ত অবসর ওকে ঘিরে ধ'রলে। শূন্য গৃহে মন হু হু ক'রে ওঠে—পিসিকে গিয়ে ব'ললে, "কবে যাবে বড়মা দেশে ?"

পিসি ভাইঝির মন বুঝলেন, ব'ললেন, "কাল দুপুরের গাড়ীতেই তো রওনা হব মা! আমি এ ধারের গুছিয়ে ফেলি, তুই প্রদীপ-দের বাড়ী দেখা ক'রে আয়, কাল তো সময় পাবিনে।"

কাজল আপত্তি ক'রলে না—যাবার আগে প্রদীপের সঙ্গে দেখা করাও সঙ্গত ভাবলে।

মালবী ওকে দেখে ভারি খুশী—ব'ললে, "চল্ দাদার ঘরে গিয়ে বসি।"

"কবির ধ্যান-ভঙ্গ ক'রব ?"

মালু ওকে চিম্‌টি কেটে ব'ললে, "তুই তো মূর্ত্তিমতী কবিতা।"

প্রদীপ নিজের ঘরে তক্তাপোষের ওপর চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে বোধ করি কড়িকাঠ গুণছিল; ওদের দেখে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'সলো। কাজল যখন ওকে বিদায়-বাণী জানালে যে, সে কালকেই প্রস্থান ক'রচে, তখন প্রদীপ মুখে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেও মনে মনে ভারী দ'মে গেল। জানালার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে ও কাজলকে দেখতে পেত, ওর গলার সুর শুনতে

পেত—তাই নিয়েই নিভৃত ঘরে ব'সে সে কাব্য রচনা ক'রত, বিধাতা তাও বাদ সাধলেন :—

মালু ব'ললে, "কাজল, আজ তুমি আমাদের সঙ্গে থাবে, আমি মাকে ব'লে আসি ?"

কাজল আপত্তি ক'রলে না—মালু চ'লে গেল।

ঘরের চারিদিকে এলো-মেলো বই ছড়ানো—কাজল একখানা হাতে তুলে নিলে, "বেশ আছ প্রদীপ, কবিতা আর কাব্যগ্রন্থ !"

প্রদীপ ব'ললে, "তারপর কলেজ খুললে পড়া আর পড়া—একঘেয়ে জীবনযাত্রা ; ছুটিটা বেশ আলস্যে ভরা—স্বপ্ন দেখে কাটানো যায়। কিন্তু তুমি বেশী দিন থাকতে পারবে না, কাজলী।"

"হুকুম না কি ?"

"না, ক্ষুদ্র অনুরোধ।"

কাজল হাসলে, "আমি অনেকদিন থাকব—এক বছর।"

প্রদীপ ওর পরিহাস বুঝলে, ব'ললে, "তবে ঠিকানাটা দিয়ে যাও—আমায় তো ছুটতে হবে !"

কাজল ঠিকানা দিলে।

প্রদীপ ব'ললে, "কাল সন্ধ্যাবেলা তুমি যখন ছাদে বেড়াচ্ছিলে তখন তোমার একটি নতুন নাম দিয়েচি—"

"ভূতিনী কিম্বা পেত্নী বোধ হয়? তারাই তো অন্ধকারে ঘোরে"

"সে নামটি সন্ধ্যামণি—একটা কবিতাও লিখেচি, শুনবে ?"

কাজল মুখে ব'ললে 'পড়,' কিন্তু মনে মনে ভারী অস্বস্তি বোধ ক'রলে, কিন্তু ওকে উদ্ধার ক'রলে প্রদীপের ছোট ভাই বুণ্টু—সে দৌড়ে এল—"কাজলদি—"

"কি ভাই বুণ্টু?"

"তুমি যেতে পাবে না—"

"কেন বল ত?"

"দাদা আমায় যে রূপকথা বলে, তার রাজকন্যা না কি তুমি —তোমাকে দেখে দেখে ও গল্প তৈরী করে—তুমি চ'লে গেলে ও গল্প ব'লবে না।"

"খুব ব'লবে—সত্যিই তো আমি রাজকন্যা নই।"

প্রদীপ ব'ললে, "না, এবার তুমি মাটির ঘরের মেয়ে হবে— কিন্তু দুঃখ এই যে আমি তারি প্রদীপ হ'তে পারবো না।"

কাজল বুণ্টুর হাত ধ'রে মালবীর খোঁজে গেল—উত্তর দিলে না।

পাড়াগাঁয় তিন রাত্রি বাস ক'রবার পরেই কাজল বুঝলে এটা ক'লকাতা নয়, এখানে যা-খুশী করবার জো নেই। মনে মনে হাঁপিয়ে উঠলো। পিসিকে ব'ললে, "বড়মা, আমি কি সং না পুতুল যে দিন-রাত্তির লোকে ভিড় ক'রে আমায় দেখবে? নির্জ্জনে থাকব ব'লে এলাম, এখন দেখছি না এলেই ভাল হ'ত।"

পিসিমা ব'ললেন, "ওরা তো তোদের মত জামা-জুতো-পরা আইবুড়ো মেয়ে দেখেনি—তাই অমন হাঁ করে থাকে, দুদিনেই স'য়ে যাবে।"

পিসির দেওরপো-বউ ওরই সমান বয়সী; ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে নিজের ঘরে। ব'ললে, "শাশুড়ীদের সামনে তো কথা ব'লতে পারিনে, এসো একটু গল্প করি।"

এই ঘোম্‌টা-ঢাকা পাড়াগেঁড়ে বউয়ের সঙ্গে সে কি কথা ব'লবে ভেবে পেলে না, তবু একটু হেসে ব'সলো। বউ ব'ললে, "জ্যাঠাই-মা তোমায় সঙ্গে ক'রে এনেচে কেন, ভাবচ বুঝতে পারিনি?"

কাজলের চোখে কৌতুক ফুটে উঠলো, "কেন বল ত?"

"ঠাকুরপোর সঙ্গে যে তোমার বে' দেবে।"

কাজল সভয়ে ভাবলে, কি সর্ব্বনাশ! সেই গেঁয়ো ভূত—চালচুলোহীন। দেখলেই দাঁত বার ক'রে হাসে। তার সঙ্গে বিয়ে!

বউ ব'ললে, "চুপ করে আছ যে? মনে ধরেচে তো আমার দেওরকে?"

কাজল ব'ললে, "কি তুমি যা-তা ব'লচ ভাই।"

"ওমা যা-তা ব'লব কি? এতো দৈবির ঘটনা নয়, এ যে সব তৈরী-করা ব্যাপার—সব আগে থেকেই ঠিক আছে। তোমার বাপ ঠাকুরপোকে এত এত টাকা দেবে—গাড়ী দেবে, বাড়ী দেবে; নামেই যা হবে ভাই, ঘর তো ক'রবে না?"—বউ একটি নিশ্বাস ফেললে।

কাজল তো অবাক—"তুমি মিছি মিছি ব'লচ নিশ্চয়ই। ওর সঙ্গে কেন আমার বিয়ে হবে?"

বউ চোখ কপালে তুলে ব'ললে," মিছি মিছি? কাগ-পক্ষী জানে এ কথা? তোমার বড়মা'ই তো ঠাকুরপোকে ডেকে বলেচে —আমি তার মুখ থেকেই শুনলুম।"

ব'লতে ব'লতে বউয়ের দেওর ঘরে ঢুকলে, "কি বৌঠান, পান-টান আছে?"

কাজল উঠে পালাতে গেল—বলু অথবা বলাইচাঁদ দাঁত বের ক'রে ব'ললে, "পালাও কেন? আমি কি বাঘ যে খেয়ে ফেলব?"

বউ ওর আঁচল ধ'রলে--অনিচ্ছায় কাজলকে আবার ব'সতে হ'ল।

বলু আর কাজলের মুখ থেকে চোক নামায় না—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। ওর বৌঠান ঠাট্টা ক'রে ব'ললে, "কি ঠাকুর-পো, তুমি যে দৃষ্টি দিয়ে গিলচ।"

আবার পান-খাওয়া বত্রিশ-পাটি দাঁত এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল —"খাসা দেখতে—একবার মুখটা ঘোরাতে বল না, বৌঠান।"

কাজল এবার জোর ক'রে পালালো। বড়মা'র উপরে রাগে অভিমানে ওর চোখে জল এল। এখুনি গিয়ে যে একটা মীমাংসা

ক'রবে তার জো নেই—এখানে তাঁর দেখা পাওয়াই মুস্কিল—সকল জায়গায় কাজলের অবাধগতি নিষেধ। হয় তিনি দেওরের সঙ্গে বিষয় নিয়ে বচসা ক'রচেন, নয় ত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন—জা, ননদ, শ্বাশুড়ী, সই, আত্মীয়বন্ধুর আর অভাব নেই। রাত্রে তিনি যখন শুতে আসেন তখন কাজলীর অর্দ্ধেক রাত—ভোর-বেলা আবার কখন যে ওঠেন কাজল জানতেই পারে না তো কথা কইবে কখন? আর সবার সামনে বলবার মত কথাও নয়! একখানা চিঠি লেখবার মত নির্জ্জন জায়গাও খুঁজে পায় না—তাই নিজের মনে নিজেই রেগে মরে, কোন প্রতিকার হয় না।

এম্‌নি অবস্থায় একদিন পিসি চ'লে গেলেন পাশের গাঁয়ে তাঁর খুড়শ্বশুরের বাড়ী—সেখানে কার জলবসন্ত হ'য়েচে তাই কাজলকে সঙ্গে নিলেন না, দেওরপো-বউএর জিম্মায় রেখে গেলেন যাবার আগে কাজলের সঙ্গে নিভৃতে কোন কথা বলবার স্থযোগও পেলেন না—সময়ও না।

আরও ক'দিন কাটলো। বলুর অসভ্য রসিকতায় ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে কাজল একদিন বউকে গিয়ে ব'ললে, "তোমার দেওরকে আমার সাম্‌নে আসতে মানা ক'রে দিয়ো—"

বউ খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো, "কেন লো, শুভদৃষ্টি না হয় রোজ রোজ হবে।"

কাজল কাকে বোঝাবে?—ওরা নিজেদের রসিকতা নিয়েই মত্ত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আকাশে মেঘ ঘন হ'য়ে উঠলো—গ্রামের বউঝিরা সকাল সকাল জল নিয়ে বাড়ী ফিরলে—পথ জনশূন্য, পুকুরঘাট নির্জ্জন—কাজল সবার অলক্ষ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

গুমোট গরম, বাতাস বন্ধ হ'য়ে আছে, পুকুরের জল স্থির, গাছের পাতাটি নড়ে না। হঠাৎ মনে হ'ল আজ ওর জন্ম-দিন—এমন দিনে বাবা, দিদি, সকলের কাছ থেকে দূরে আছে মনে ক'রে ওর মনটা বেদনায় ভ'রে উঠলো। পুকুরঘাটে ব'সে আঁচলে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ কাঁদলে।

তারপর কি মনে ক'রে উঠে গ্রামের পথ ধ'রে ষ্টেশনের দিকে চ'ললো। আঁধার গাঢ় হয়ে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়তে সুরু হয়েচে—বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্চে—সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি ওর বুকে চমক লাগিয়ে দিচ্চে। কেন যে যাচ্চে, কোথায় যে যাচ্চে, কেউ জিজ্ঞেস ক'রলে হয়তো সঠিক উত্তর দিতে পারে না। বহুক্ষণ চোখের জলবর্ষণের পর ওর মনে তখন ঘূর্ণী হাওয়া লেগেচে—ওকে আর স্থির থাকতে দেবে না।

বিদ্যুতের আলোয় দেখলে সামনে কে ছাতামাথায় এগিয়ে আসচে—লোকটা একেবারে ওর ঘাড়ের ওপর প'ড়লো। "আহা কে—দেখতে পাইনি"—অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু গলার সুরে কাজল চমকে উঠলে। আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই ছাতাধারী ব'লে উঠলে, "এ কি! এ যে কাজলী!"

"তুমি প্রদীপ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্চ?"

"যেখানে দু'চোখ যায়—কিন্তু তুমি এসেচ কেন?"

"আজ যে তোমার জন্মদিন, কাজলী—অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই দূরে থাকতে পারলাম না—একবার দেখা দিতে এসেচি—যদি রাগ কর এখুনি চলে যাবো।"

"আচ্ছা যাও, কিন্তু আমাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল।"

"এ কি ব'লচ ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারচি না।"

"বুঝবে পরে ; উপস্থিত আমার বিষম বিপদ—তার থেকে রক্ষা পাওয়া চাই। সব কথা বলবার সময় নেই, বড়মা এখানে আমার বিয়ে ঠিক ক'রেচেন—বর আমার পছন্দ নয়—কাল সে বড়মার অবর্ত্তমানে আমায় জোর ক'রে বিয়ে ক'রবে। তার আগে আমি পালাতে চাই।"

"জোর করে বিয়ে ক'রবে ? বড়মা কই ?"

"তিনি গেছেন পাশের গাঁয়।"

প্রদীপ এবার ভাবনায় প'ড়লে।—"তবে তোমার সত্যি বিপদ বটে ! আমি তোমায় রক্ষা ক'রব—কিন্তু আগে বড়মা'র কাছে যাওয়া চাই। তাঁর ঠিকানা জান ?"

"জানি, আলতাগাঁয়ে রামলাল ঘোষালের বাড়ী।"

"এসো কাজলী, ষ্টেশন বেশী দূরে নয়—একটা গরুর গাড়ী নেব, তারপর দু'জনে আলতাগাঁয়ে গিয়ে বড়মা'র কাছে ব্যাপারটা শুনবো। আমার মনে হয়, নিশ্চয় কোন ভুল হয়েচে !"

কাজল আর কিছু ব'ললে না, ওর সঙ্গে সঙ্গে চ'ললো। একধারে ডোবা পুকুর, একধারে ঝোপ, মাঝখানে সরু আলের মত পথ—দু'জনে পাশাপাশি একটি ছাতার তলে তলে এগিয়ে চ'ললো। ছাতার গা বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল প'ড়ে ওদের চুল, বসনপ্রান্ত ভিজিয়ে দিলে। পথেই গরুর গাড়ী মিলে গেল—আলতাগাঁ গাড়োয়ানের অজানা নয়—বক্‌সিসের লোভ দেখিয়ে প্রদীপ ব'ললে, "যত শীগগির পারিস পৌঁছে দে।"

গ্রামের পথ ধ'রে ষ্টেশন ছাড়িয়ে গাড়ী চ'লতে লাগলো। ক্রমে বৃষ্টি বন্ধ হ'য়ে কৃষ্ণপক্ষের আকাশে দু'একটি তারা ও ক্ষীণ

চাঁদ উঁকি মারলে। ওরা ছাউনির তল থেকে বাইরে এসে ব'সলো—হাওয়ায় ওদের কাপড় শুকিয়ে গিয়েছিল।

কাজল এতক্ষণ অবসন্নের মত ব'সেছিল, প্রদীপও ওকে বিরক্ত করেনি। হাওয়ায় যখন ওর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েচে, ক্লান্তস্বরে ব'ললে, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে প্রদীপ, এখানে একটু শুই—'

প্রদীপ আপত্তি ক'রলে না—অল্পক্ষণ পরে শিশুর মত নির্ভাবনায় কাজল ঘুমিয়ে প'ড়লো। প্রদীপ ওর মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে রইল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল—আজকের রাতটি তার জীবন-কক্ষে প্রদীপের মত জ্বলতে থাকবে। কাজলীর প্রতি ওর মন সম্ভ্রমে নুয়ে প'ড়েচে—ওর জীবন ধন্য হ'য়ে গেছে।

রাত্রি গভীর হ'ল, গরুর গাড়ী অপেক্ষাকৃত চওড়া পথ ধ'রে এক মোড়ের মাথায় এসে থামলো। গাড়োয়ান ব'ললে, "ঐ যে ওধারের কোঠা বাড়ী—ওটাই রামলাল বাবুর ঘর।"

গাড়োয়ানের কণ্ঠস্বরে কাজল ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সলো—সে যে এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তা' দেখে নিজেই আশ্চর্য্য বোধ ক'রলে! ওরা গাড়ী থেকে নেমে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে। বহুক্ষণ ঠ্যালাঠেলির পর কে এসে দরজা খুললে—"কে গা, রাত দুপুরে ডাকাত না কি?"—তারপর বাতির আলোয় কাজলকে দেখে ব'ললে, "ওমা এ যে মেয়েলোক—দাঁড়াও বাছা গিন্নিকে খবর দিই—"

কাজল ব'ললে "শ্রীযুক্তা নিভাননী দেবীকে আমার দরকার; তিনি কি এখানে—"

প্রদীপধারিণী ব'ললে, "কি ব'লচ, বাছা, ভাল বুঝতে পারচিনে —গিন্নিকে ডাকি।"

গোলমালে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু নিশুত রাত্রে কি বিপদের সম্ভাবনা মনে ক'রে চোখ খুলতেও সাহস পাচ্ছিলেন না—এখন সকলেই বেরিয়ে এলেন।

পিসিকে দেখেই কাজল দৌড়ে গেল—"বড়মা!"

"ওমা কাজল, তুই?—কি সর্ব্বনাশ!"

ও পিসিকে একধারে টেনে নিয়ে গেল, "বড়মা, বলুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্চ?—"

বড়মা আকাশ থেকে প'ড়লেন,—"ওরে তুই কি পাগল হয়েচিস?"

কাজল আদ্যোপান্ত পিসিকে ব'ললে।

শুনে তিনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সলেন!

কাজল ব'ললে, "তুমি চ'লে যাবার পর ওরা বিষম বাড়াবাড়ি ক'রছিল—ভয়ে আমার গায় কাঁটা দিয়ে থাকত—কালকেই দোর বন্ধ ক'রে পুরুৎ ডেকে আমায় বিয়ে ক'রবে ব'লেছিল।"

পিসি চোখে অন্ধকার দেখলেন,—"কার সঙ্গে এলি তুই?"

"প্রদীপের সঙ্গে—সে আসছিল আমার জন্মদিনে ভালবাসা জানাতে—পথেই দেখা—তার সঙ্গেই ক'লকাতা যাচ্চি।"

পিসি এবার অন্ধকারে আলোর রেখা দেখলেন,—"চল্ চল্, ওকে এখুনি ব'লে পাঠিয়ে দিই।"

"তাই বল বড়মা, ও তোমার মত না পেলে আমায় নিয়ে যাবে না!"

পিসি-ভাইঝির ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলা দেখে বাড়ীর

সকলে অদম্য কৌতূহলও দমন ক'রে শুতে চ'লে গিয়েছিল, কেবল গিন্নি একপাশে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিলেন। পিসি তাঁর কাছে এসে চুপি চুপি ব'ললেন, "ছোট খুড়ি, শোও গিয়ে—তোমার আবার বুকে ব্যথা ধ'রবে—আমি ভাইঝির একটা ব্যবস্থা ক'রে যাচ্চি।"

খুড়ী চোখ কপালে তুলে ব'ললেন, "হয়েচে কি ?"

"জামাই নিতে এসেচে—মেয়ে পাঠাচ্চি।"

"এত রাত্তিরে ? তা' একটু জল টল থাক্—কর্ত্তাকে ডাকি।"

পিসি বাধা দিয়ে ব'ললেন, "তা হবার জো নেই খুড়ি, জামায়ের বাপের ব্যারাম, এক্ষুণি যেতে হবে।"

* * * * *

বাইরে প্রদীপ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে অপেক্ষা ক'রছিল। পিসি ব'ললেন ; "বাবা, মেয়ে আমার কাণ্ড ক'রে বাড়ী থেকে বেরোলেন, এখন শেষ রক্ষা কর তুই—ওকে সঙ্গে ক'রে ক'লকাতা নিয়ে যা। পৌঁছে মেঘকে তার ক'রে দিস, সুবোধ এসে নিয়ে যাবে।"

প্রদীপ মন্ত্রমুগ্ধের মত ব'ললে, "তা হ'লে এখুনি রওনা হই পিসিমা,—রাত চারটেতে একটা গাড়ী আছে—"

"হ্যাঁ, তবে সেইটেতেই যা"—তারপর কাজলকে একবার বুকের কাছে টেনে ব'ললেন, "আজ মনে হচ্চে তুই শৈলর মেয়েই বটে। সে অম্‌নি মুখবোজা শান্ত ছিল ; কিন্তু বিপদ এলে যে-ক'রে-হোক্ নিজেকে রক্ষে ক'রত। ভগবান আজ প্রদীপকে যেমন জুটিয়ে দিলেন—তেমনি তুইও তা'র চিরদিন মর্য্যাদা রাখিস।" তিনি মনে মনে ঠিক ক'রলেন, আজকের পরে প্রদীপের সঙ্গে কাজলের বিয়ে না হ'লে চ'ল্‌বেই না—ওদের মিলন ভগবানেরই চক্রান্ত !

গাড়োয়ান ব্যস্ত হ'তে পিসি তেত্রিশ কোটী দেবতা স্মরণ ক'রে ওদের গাড়ীতে তুলে দিলেন।

নিদ্রিত গরু দুটো তাড়া খেয়ে আবার গাড়ীটা টেনে চ'ললো—নিস্তব্ধ প্রান্তরে চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ প্রতিধ্বনি হ'য়ে উঠলো। শেষ রাত্রের কনকনে হাওয়ায় কাজল কেঁপে কেঁপে উঠছিলো—প্রদীপ নিজের চাদর খুলে ওকে জড়িয়ে দিলে, তারপর একটু অপরাধের সুরে ব'ললে, "জান কাজলী, পিসিমা ব্যস্ত হবেন ব'লে ব'ললাম না—বাড়ীতে আমাদের কেউ নেই, বাবা-মা'রা রাঁচি গেছেন, আমি কেবল একা আছি।"

নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে কাজল ব'ললে, "ভালই তো, কারো কাছে জবাবদিহি ক'রতে হবে না—এসব ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ক'রতে ঘেন্না ধ'রে যায়। শঙ্কর আছে, সে ঘর খুলে দেবে—খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঐ ক'রবে। তারপর রাত্রের ট্রেনে তুমি আমায় দারজিলিং পৌঁছে দিতে পারবে না?—দিদিদের ব্যস্ত ক'রতে ভাল লাগে না।"

ওর এই নির্ভরতাটুকু প্রদীপের এমন ভাল লাগলো—আনন্দ তখন ওর বুকের কানায় কানায় উপচে প'ড়চে—নীরবে সম্মতি জানালো—নিজের কণ্ঠকেও যেন বিশ্বাস নেই—।

কাজল ব'ললে, "কিন্তু টাকা?—"

"কোনো ভাবনা ক'রো না, আমার কাছে যথেষ্ট আছে।"

তারপর দুজনে নীরবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল—রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে তখন পূব আকাশে ভোরের আলো দেখা দিচ্চে।

১৬

ক'লকাতা পৌঁছে কাজল শঙ্করকে দিয়ে ওদের নীচের একটা ঘর খুলিয়ে নিলে। তারপর একটা ধূলিমলিন চৌকির ওপর ক্লান্ত ভাবে ব'সে প'ড়ে ব'ললে, "যাও প্রদীপ, বাড়ী থেকে স্নান ক'রে কিছু খেয়ে এসো,—আমি শঙ্করকে বাজারে পাঠিয়ে রান্নার জোগাড় ক'রচি—"

প্রদীপ ব'ললে, "তবে তুমিও এসো, কাজলী, কিছু খেয়ে যাও, কাল রাত থেকে খাওনি—"

"না, খাবার আমার কিছু দরকার নেই—আমি একটু বিশ্রাম না ক'রে বাঁচবো না।"

দ্বিতীয় অনুরোধ বৃথা জেনে প্রদীপ চ'লে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে স্নান ক'রে খেয়ে কাজলের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসে প্রদীপ দেখলে—সে চৌকিতে ধূলোর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে প'ড়েচে। সারা রাত্রের ক্লান্তিতে তার বড় বড় চোখের তলে কালিমা দেখা দিয়েচে ; তবু ওর ঘুমন্ত মুখখানি এমন করুণ সুন্দর যে, প্রদীপ নির্ণিমেষনেত্রে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

কাজল ঠিক ঘুময়নি—এতই শ্রান্ত হ'য়েছিল যে চোখ বুজে প'ড়েছিল। জানালা দিয়ে রোদ এসে তার গায়ে লাগছিল—প্রদীপ সেটি বন্ধ করতে যাওয়ার মৃদু শব্দেই সে উঠে ব'সলো।

পাশে ব'সে তার নরম হাতটি নিজের মুঠোর ভেতর নিয়ে প্রদীপ ব'ললে, "বড্ড ক্লান্ত হয়েচ, না ?"

"তুমি বুঝি কিছু কম ?"

"না, আমি মোটেই ক্লান্ত হইনি, কাজলী ; আমার ভারী ভাল লাগচে—ইচ্ছে ক'রচে তোমায় ছোট বেলার মত আদর করি—"

যে কখনো চঞ্চল হয় না, দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে না, তার মুখে এমন কথা শুনলে মনটা কেমন করে। কাজল হাত ছাড়িয়ে নিলে। কিছুক্ষণ পরে ব'ললে, "আমি ঠিক ক'রলাম, শঙ্করের সঙ্গেই শিলিগুড়ি অবধি যাবো—তারপর জামাইবাবু এসে নিয়ে যাবেন। এখুনি একটা তার ক'রতে হবে ; টাকা শঙ্করই দিতে পারবে—তোমাকে আর ব্যস্ত হ'তে হবে না।"

কি অপরাধে যে প্রদীপের এত বড় দণ্ডবিধান হ'ল, তা প্রদীপ বুঝতে পারলে না, তবে তাই নিয়ে সে অনুযোগও ক'রলে না ;—ভালো জিনিষকে পরিপূর্ণ উপভোগ না ক'রেও আপন অন্তরে তার কল্পনার লীলায় সে বিভোর হ'য়ে থাকতো। মুখে ব'ললে, "বেশ, তাই হবে।"

১৭

কাজল দারজিলিং এসে কাউকে কিছু ব'লতে চাইলে না। বিজলীর অসংখ্য প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্যে শুধু ব'ললে, "এসেচি ব'লে বুঝি খুশী হোসনি দিদি? তাই, কেন চ'লে এসেচি কেবলি জিজ্ঞেস করচিস্?"

বিজলী কাজলকে আদর ক'রে ব'ললে—"খুশী হইনি? তুই কি বলিস, কাজু? এখানে এমন আমোদ-আহ্লাদ, আর তুই রইলি সেই পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে—এতে কি কারো ভাল লাগে?" তারপর একটু হেসে ব'ললে, "তোর বর ঠিক করেচি কাজল, আমার মাসতুতো দেওর অনিল, এমন চমৎকার ছেলে কি বলব ভাই,—তোর খুব পছন্দ হবে। আজ বিকেলে তাকে আসতে ব'লেচি, দেখিস—"

সর্ব্বনাশ! এখানেও সেই বর? কাজল মনে মনে বিষম চ'টে উঠলো—বিয়ে আর বর শুনলেই ও অস্থির হ'য়ে ওঠে—মনে হয় ওকে কেউ অত্যন্ত কটু ওষুধ খেতে ব'লচে! ব'ললে, "তোর দেওরের জন্মজন্ম সুপাত্রী জুটুক দিদি, কিন্তু আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই!"

বিজলী ভাবলে—এটা কাজলের মনের কথা নয়, ছলনা মাত্র। তাই সে মেঘনাদের কাছে প্রস্তাবটা তুলতে গেল।

মেঘনাদ সবিস্ময়ে ব'ললেন, "মা, ও যে নিতান্ত ছেলেমানুষ—"

বিজলী রাগ ক'রে ব'ললে, "পনেরো বছরের মেয়েকে ছেলেমানুষ ব'লো না বাবা, এই ঠিক বিয়ের বয়স। তা ছাড়া, ওর বিয়ে দিলেই তো তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে মেঘনাদের চিন্তা কতখানি তা বলা কঠিন। তাঁর কেবল মনে হ'ল, এই তো সেদিনের কাজল—শৈল ওঁর হাতে দিয়ে চোখ বুজলে—এখুনি কি তাকে পরের ঘরে পাঠাতে হবে!—ব'ললেন, ছেলেটি কেমন?"

"সে তুমি পছন্দ না ক'রে পারবে না, বাবা—"

"বেশ, কাজলের মত নাও তা হ'লে।"

"সে সব ঠিক আছে।"

মেঘনাদ হাসলেন, কিছু ব'ললেন না।

যথা সময়ে অনিল এসে পৌঁছলো। বিজলী কাজলকে যতটা পারলে সাজিয়ে-গুজিয়ে টেনে আনলে বসবার ঘরে। পাছে কাজল লজ্জা বোধ করে তাই মেঘনাদ আর সুবোধকে আগেই বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কাজল অনিলের দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে একটা ছবির বই খুলে ব'সলো। অনিল সেটিকে কিশোরী-হৃদয়ের লজ্জা কল্পনা ক'রে উপভোগ ক'রলে—যথাসম্ভব বিনয় ক'রে ব'ললে, "স্বীকার করি, আপনার চোখ দুটি খুব সুন্দর—আমার এ বিশ্রী মূর্ত্তি দেখবার অনেক ওপরে; তবু যদি একটু দয়া ক'রে হাতের বইটা রেখে আমার সঙ্গে আলাপ করেন তা হ'লে বুঝবো বিধাতা আপনাকে শুধু সৌন্দর্য্যই দেন নি, উদারতাও যথেষ্ট দিয়েছেন।"

বিজলী দেওরের আলাপের ভূমিকার বহর দেখে মুগ্ধ হ'ল,—কাজল কিন্তু বইটা চোখের কাছে ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের সঙ্গে ছবি দেখতে লাগলো—কোনো জবাব দিলে না।

অনিল তাতে দমলো না ;—ব'ললে, "যতই মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখুন কাজলী দেবী, ঘরে যে আমি রয়েচি তা আপনাকে স্বীকার ক'রতেই হবে।"

কাজলী এবার উত্তর দিলে ; ব'ললে, "অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই, এতই গোলযোগ আপনি ক'রচেন।"

বিজলী বোনের কথায় অপ্রতিভ হ'ল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে, "তবে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি—" ব'লে খাবার আনতে চ'লে গেল। কাজলী তেমনিভাবে ছবি দেখতে লাগলো। অনিল ব'ললে, "আপনি ছবি দেখতে এত ভালবাসেন কাজলী দেবী, বৌঠান যদি আগে একথা ব'লতেন,আমি খানকতক আজকালকার শিল্পীদের আঁকা নতুন ছবি নিয়ে আসতুম।"

কোনো উত্তর, এমন কি একটা ধন্যবাদও না দিয়ে কাজলী তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাতা উল্টে গেল।

"দেখুন, আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখচি—কি রকম ধরণের আলাপ ক'রলে আপনি খুশী হন, আমায় যদি একটু আভাস দেন—কৃতার্থ হব।"

কাজলের ইচ্ছা হ'ল বলে, "আপনি একটু চুপ ক'রে থাকলেই খুশী হই ;"—মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে রইল, কোনো উত্তর দিলে না।

বিজলী খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কি গো, আলাপ-টালাপ হ'ল ?"

অনিল মৃদু হেসে ব'ললে, "হ্যাঁ বৌঠান, আলাপ খুব হয়েচে ! সেই আপনার সাক্ষাতে একবার যদি কথা না কইতেন, তা হ'লে ব'লে যেতাম—আপনার বোনকে বিধাতা আর সবই দিয়েচেন কিন্তু কথা কইবার শক্তি দেন নি।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে, "আচ্ছা আজ চল্লাম, কিন্তু যাবার আগে আপনার বোনকে এই গোলাপটি উপহার দিতে চাই।" ব'লে জামার ভিতর থেকে একটি বড় টক্‌টকে গোলাপ ফুল বার ক'রলে।

বিজলী ব'ললে, "এটা যে বিদ্রোহের রং হ'ল, ভাই !"

"সেই জন্যেই ওঁর কালো চুলে খুব বেশি মানাবে।" ব'লে ফুলটি কাজলের হাতে দিলে।

কাজলকে গ্রহণ ক'রতে হ'ল। কিন্তু একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে থেকে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে—তারপর ফুলটি বিজলীর খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিজলী বোনের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হ'ল।

অনিলও কিছু অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললে, "আজ আলাপের প্রথম পর্ব্ব এখানেই শেষ হোক। চলুন, বায়স্কোপে যাওয়া যাক—"

বিজলী কাজলকে ডাকতে গিয়ে দেখলে সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করেচে—অভিমানে আর কিছু ব'ললে না—নিজের বড় কোটটি নিয়ে অনিলের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বন্ধ-ঘরে কাজলের চোখ ফেটে জল এল। দিদি এ-সবের প্রশ্রয় দেয় কি ক'রে ? সুবর্ণলতার শিক্ষার বাহাদুরি আছে, এই ক'মাসে এত পরিবর্ত্তন !

হঠাৎ কি মনে ক'রে প্রদীপকে চিঠি লিখতে ব'সলো। হঠাৎ

মনে হ'ল এই সময় ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এইটিই তার সব চেয়ে দরকারী কাজ। লিখলে—

প্রদীপ—

আসবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিলাম; আশা করি, তুমি রাগ করনি, আমায় মাপ কর।

কাজলী

১৮

বিজলী মেঘনাদের কাছে গিয়ে ব'ললে, "বাবা, কাজল এমনি কুনো আর অসভ্য হয়েচে—কারো সঙ্গে কথা ব'লতেই জানে না। আজ অনিলের সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করেচে,—সে খুব ভালো ছেলে ব'লেই কিছু মনে করেনি।"

মেঘনাদ কিছুমাত্র চিন্তিত না হ'য়ে ব'ললেন, "তাই তো মা, কি হবে!"

"তোমার আদরেই ও প্রশ্রয় পায়। দাও ওকে বোর্ডিংএ পাঠিয়ে—দিনকতক সেখানে থেকে সভ্যতা শিখুক।"

বিজলী এখন ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজে একজন প্রধানা 'আলোকপ্রাপ্তা' মহিলা; তার নব্য মত এখন সকল সংস্কার ছাড়িয়ে উঠেচে—তাই ওর বোনকেও ঘ'ষে-মেজে নিজের মত ক'রে নিতে চায়।

*　　*　　*　　*　　*

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি শিক্ষকতা চলে—কাজল মুখ গম্ভীর ক'রে দিদির উপদেশ শোনে—কলের পুতুলের মত চলা ফেরা করে। বিজলী মনে মনে ঠিক করেচে—আরো দিন-পনেরো পরে অনিলকে আবার ডাকবার সময় হবে। কিন্তু ওর হিসেবে ভুল হ'য়েছিল।

এমনি সময় এল প্রদীপের এক চিঠি। প্রদীপ লিখেচে—

কাজলী—

ভাগ্যে তোমার ধন্যবাদের কথা মনে প'ড়লো—তাই ত তোমার চিঠি পেলুম—আমার সমস্ত মন আলোয় ভ'রে উঠলো। তুমি বড় কচি—ফুলের মত নরম তোমার মন,—তোমাকে সব কথা বলা সাজেনা—বলা উচিতও নয়।

তবু পাছে বিলম্বে কিছু অঘটন ঘ'টে যায়—তাই ব'লে রাখি—তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে কাজলী—তুমি কি কোনো-দিন আমার হবে—? আমি চিরজীবন তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবো—মৃত্যুর পরেও।

প্রদীপ

কাজল অবাক হ'য়ে গেল—তবে কি প্রদীপেরও ভালবাসা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ স্বার্থের গন্ধে ভরা? ও কেন এ ভাবে পেতে চায়? বন্ধুর মত, ভাইএর মত কি পাওয়া যায় না? ওর সমস্ত মন বিষিয়ে তেতো হ'য়ে উঠলো—চিঠিখানা কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে সে মেঘনাদের কাছে গেল। "বাবা, ক'লকাতা যাই চল।"—মুখোমুখি প্রদীপকে খুব একটা বকুনি দেয় এই তার ইচ্ছে।

বিজলী ব'ললে, "সে কি ক'রে হবে? ডাক্তারের হুকুম, বাবাকে আরো তিন মাস থাকতে হবে।"

কাজল ব'ললে, "তবে আমায় বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দাও। এখানে পড়ার বড্ড ক্ষতি হচ্চে।"

কাজল কখনো আবদার করে না ব'লে মেঘনাদ তার মনের ক্ষীণতম ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ ক'রতে ব্যস্ত হ'তেন; ব'ললেন, "পরীক্ষা যখন নিকটে, তখন থাক্ না কিছু দিন বোর্ডিংএ। বিজলী, কি বলিস?"

বিজলী অভিমান ক'রে ভাবলে, সেই ছোট্ট আদরের বোনটি —সে দু'দিন দিদির কাছে থাকতে চায় না, এত পর হ'য়ে গেছে! ব'ললে, "আমায় কেন জিজ্ঞাসা ক'রচ, বাবা? যা তুমি ভাল বোঝ কর।"—বিজলীর চোখে জল এল।

কাজল বিজলীকে জড়িয়ে ধ'রে চুপি চুপি ব'ললে, "আচ্ছা দিদি, জামাই বাবুর চেয়ে আমায় এখন কতটা কম ভালবাসিস?"

বিজলী রাগ ক'রে চ'লে গেল।

কাজল বাপের সম্মতি পেয়ে যাত্রার আয়োজনে লেগে গেল। পিসিমাকেও সে কথা জানানো হ'ল। তিনি লিখলেন, "এ তোরা কি ক'রচিস্? প্রদীপের সঙ্গে কাজলের বিয়ের সবই তো ঠিক, দুই-হাত এক হ'লেই হয়, এখন বোর্ডিংএ যাওয়া কেন? আমি ক'লকাতা যাই, শুভদিন দেখে বিয়ে হ'য়ে যাক।"

বিজলী সে চিঠি কাজলকে প'ড়তে দিলে। কাজলের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে প'ড়লো—"দিদি, আমি কি তোমাদের পথের কাঁটা? আমার কোথাও কি একটু স্বস্তির জায়গা নেই—চারদিকে আমায় বন্ধনের জাল দিয়ে ঘিরে না দিলে কি তোমরা নিশ্চিন্ত হবে না?"

বিজলী তো অবাক! ব'ললে, "থাক ভাই,—থাক। তোর বিয়ে ক'রে কাজ নেই—এমনি একা একাই ভাল থাক।"

১৭

কাজলের বোর্ডিং-এর জীবন সুরু হ'ল,—তার একঘেয়ে জীবনের মধ্যে ভারী একটা নূতনত্ব এল!—যদিও সমবয়সী কারো সঙ্গে ও মিশতে পারে না,—কেউ বলে অহঙ্কারী, কেউ বলে খেয়ালী, কেউবা বলে ভাবুক,—তবু ছোট মেয়েরা ওকে ভারী ভালবাসে! ওকে কাজলদি ব'লে যখন জড়িয়ে ধরে কেউ—ও তাকে আদর ক'রে গল্প ব'লে ছোট্ট বোনের মত স্নেহ করতে চায়! তাদেরি মধ্যে রাণুর সঙ্গে ওর ভারী ভাব হ'ল। সে এত ছেলেমানুষ, এত কচি যে, কাজলের সাথীহারা মন ওর মধুর সঙ্গটি ভারী উপভোগ করে। সে গলা জড়িয়ে বলে, "কাজলদি গল্প বল"—কাজল তাকে ছেলেমানুষের মত বাঘের গল্প শোনায়। কখনো ওরা দুজনে খেলা করে, নয় ত গান করে, নয় ত চুপচাপ ব'সে থাকে! রাণু যে বড় বড় কথা জানে না—ওর ভেতরে এতটুকু কৃত্রিমতা যে এখনও ঢোকেনি—এইটেই কাজলের ভালো লাগে।

মেঘনাদ আর তাঁর দিদি বালীগঞ্জের অতবড় বাড়ীর এককোণে আশ্রয় নিলেন। মেঘনাদের দিন কাটতো নিজের আফিসের কাজে, পড়াশোনায়, নয় তো বিজলীর বাড়ীতে নতুন ছোট্ট নাতীটিকে আদর ক'রে।

আর তাঁর দিদির দিন কাটে, মেঘনাদের অবিবেচনায় রাগ ক'রে, শূন্য বাড়ীতে কাজলের জন্যে চোখের জল ফেলে, আর জপতপ পূজো-অর্চ্চনা নিয়ে।

ছুটিতে কাজল মাঝে মাঝে বাড়ীতে এসে বিজলীর খোকাকে

আনিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে আদর ক'রে অস্থির ক'রে তোলে—নয় ত নীরবে বাপের কাছে ব'সে থাকে!—কথনো যদি ব'লেচে, "বাবা তোমার যদি কষ্ট হয়, আমি চ'লে আসি," তিনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লেচেন, "না মা, তোর কষ্ট হ'লেই আসিস—আমার নিজের কোনো কষ্টই গায়ে লাগে না।"

* * * * *

কাজলের পরীক্ষা এসে প'ড়েচে, এখন তাই ঘন ঘন বাড়ী আসতে পারে না। এমন সময়, এল তার বহুদিনের পুরণো বন্ধু প্রদীপের বোন মালবীর এক চিঠি। সে লিখেচে—

কাজল ভাই—

অনেকদিন তোকে চিঠি লেখা হ'য়ে ওঠেনি, রাগ করিসনে! তুই বোধ হয় জানিস, দাদা বেনারসে ইঞ্জিনীয়ারিং প'ড়তে গেছে বাবাকে খুশী করবার জন্যে—আর নিজেকে খুশী করবার জন্যে দেদার কবিতা লিখচে। যাবার আগে তার বিশেষ অনুরোধে আমি এই চিঠি তোকে লিখচি। সে তোকে ভালবাসে—কত যে ভালবাসে তা মুখে বলা যায় না কাজল—সে তোর জন্যে পাগল, তুই কি তার ভালবাসা গ্রহণ করবি নে, কাজল? যদি করিস আমায় চুপিচুপি লিখিস ভাই, আমি সব ব্যবস্থা করবো। উত্তরের আশায় রইলাম।

তোর মালবী

চিঠিখানি কাজল অনেকবার প'ড়লে। নিজের মনের নিভৃত প্রদেশ খুঁজেও প্রদীপের ভালবাসা গ্রহণ করবার কোনো বাসনা খুঁজে পেলে না—ভাবতে লাগলো।

রাণু এসে ব'ললে "কি ভাবচ, কাজলদি ?—"

"কি ভাবচি জানিস ? যা ইচ্ছে করে না তা কি করা উচিত ?—"

"কক্‌খনো না ; আমি আজ অঙ্ক কসিনি—"

"তার জন্যে যদি বকুনি খাস্, সবাই মন্দ বলে ?—"

"তা হ'লে ইংরিজী পড়া ভাল ক'রে ক'রবো—হেমদি ব'কতে পাবে না।"

"ঠিক বলেচিস—একটা কাজ যদি ইচ্ছে না করে—সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা কাজ ভাল ক'রে ক'রবো—।"

কাজলী মালবীকে উত্তর লিখে দিলে—

ভাই মালবী,

আমার রূঢ়তার অপরাধ ক্ষমা ক'রো। তোমার দাদার ভালবাসা গ্রহণ করবার শক্তিও নেই, সময়ও নেই,—উপস্থিত অন্য কাজে ব্যস্ত আছি।

কাজলী

পরীক্ষার পর কাজল বাড়ী গেল না,—বাবাকে লিখলে, "এই লম্বা ছুটিতে কুঁড়েমি ক'রে কি ক'রবো ? শান্তিনিকেতনে গিয়ে ছবি-আঁকা ও গান শেখবার ইচ্ছা। বাবা, তোমার কি মত জানিয়ো।"

বাবা লিখলেন—

"বুড়ী, যা খুশী তাই করিস, আমি দিদিকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে চল্লুম।"

২০

বছর-তিনেক পরের কথা। সুবোধ হঠাৎ দিল্লীতে বদ্‌লি হ'য়ে বিজলীদের নিয়ে চ'লে গেল। বিজলীর আবার সন্তান-সম্ভাবনা ব'লে পিসিমাও ওদের সঙ্গে গেলেন। ইতিমধ্যে কালী-কিঙ্করের মৃত্যু হয়েচে। সুবর্ণলতা ছোট মেয়ে কুন্দকে নিয়ে ক'লকাতার বাড়ীতে থাকেন, কোথাও যেতে চান না।

কাজল আই-এ পরীক্ষা শেষ ক'রে আর প'ড়বে না ব'লে হঠাৎ বাড়ী চ'লে এল। তার প্রধান কারণ—বড়দিনের ছুটির পর রাণু বোর্ডিং-এ ফিরে আসেনি—। কাজলী তাকে এতই ভালবেসেছিল যে, তার অভাবে কিছুতেই কোনো কাজে মন দিতে পারছিল না,—তাই ওকে শীগ্‌গির ক'রে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি লিখলে। কিন্তু রাণুর হাতের গোটা গোটা অক্ষরে 'কাজলদি ভাই' ব'লে কোনো উত্তরই এল না; ওর মা লিখলেন "আমার রাণু তার মার কোল খালি ক'রে চিরদিনের মত চ'লে গেছে।—"

এ খবর যেমন অকস্মাৎ, তেমনি মর্ম্মান্তিক। কাজলের মন ভেঙ্গে দিলে। সে কোনো রকমে পরীক্ষা শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে এল।

বহুদিন পরে বাপ আর মেয়ের মিলন হ'ল। মেঘনাদ দেখলেন কাজল হঠাৎ বড় হ'য়ে গিয়েচে—ওর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি এখন

উজ্জ্বল ও প্রশান্ত হ'য়ে উঠেচে। সে আর বাবার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে না,—সন্ধ্যাবেলা তাঁর কাছে ব'সে অনর্গল গল্প করে, গান করে, আর বলে রাণুর কথা।—তার ছোট্ট বন্ধুটি যে তার জীবনে কতখানি স্থান পূর্ণ ক'রেছিল একথা ব'লে ব'লেও শেষ ক'রতে পারে না!

মেঘনাদ এতদিনের শূন্য জীবনের পর কাজলের সঙ্গ পেয়ে ভারী খুশী হ'য়ে উঠলেন। ছোট ছেলের মত ওর কাছে আবদার করেন, ঝগড়া করেন—বলেন, "তুই আমায় এমন ক'রে মায়ায় বাঁধিস নি কাজল!"

ভুবনবাবুরা বহুদিন পাশের বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছেন,— প্রদীপের কোনো খবরই সে জানে না। বুলটু আর যখন তখন এসে আবদার করে না। মালবীর বিয়ে হ'য়ে গিয়েচে, সম্প্রতি তার একটি খুকু ও হয়েচে খবর এসেচে।

এক বাবা ছাড়া কাজলের আর দ্বিতীয় সঙ্গী নেই।

* * * * * *
* * *

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কাজলী বাবার আফিস থেকে ফেরার অপেক্ষায় জানালায় দাঁড়িয়েছিল, বুড়ী-নাম্নী দাসী খবর দিলে, "হল-ঘরে একজন বাবু অনেকক্ষণ বসে আছেন।"

বাবার কোনো বন্ধু মনে ক'রে পর্দার ফাঁক দিয়ে কাজল যাকে দেখলে, খুব পরিচিত তাঁর মুখ হ'লেও কিছুতেই কে তা মনে ক'রতে পারলে না। ঘরে ঢুকে ব'ললে, "একটু বসুন, বাবার আসতে

দেরী হবে না।” আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললেন, ‘কাজল, তুমি এত বড় হয়েচ !—”

গলার স্বর কাজলের মনে প'ড়লো, ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে ব'ললে, “মিহিরদা, তোমায় প্রথমটা চিনতে পারিনি।”

মিহির কাজলের মাথায় হাত রাখলে। কতটুকু ছিল সে—দীর্ঘ দশবছরে কত পরিবর্ত্তন,—না জানি আরো একজন কেমন—কত বদ্‌লেচে !

কাজল ব'ললে, “কেন এতদিন আসোনি ? তোমার বাবা নেই, কিন্তু আমরা তো তোমায় কত ভালবাসি।”

মিহির ব'ললে, “দেশে ফিরেচি মাস-ছয়েক হ'ল ; জমিদারীতে ছিলুম। ক'লকাতায় আর ফিরতে ইচ্ছে করে না।”

কাজল ব'ললে, “একা ছিলে—না বিয়ে করেচ ?”

“না বিয়ে আর কোথায় হ'ল ? বাবা যে মেয়েটিকে আমার বউ ঠিক ক'রে গিয়েছিলেন, তোমার দিদির কাছে শুনেচ বোধ হয় ?”

কাজল ঘাড় নাড়লে, “না।”

“তার বিয়ে হ'য়ে গেছে।”

কাজল দুঃখিতস্বরে ব'ললে, “আহা ! তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েচে।”

মিহির হাসলে—“কষ্ট ? নিষ্কৃতি বল। কিন্তু অপরাধটা সম্পূর্ণ আমার নয়,—মেয়ের বাপ মনে ক'রলেন, হয় আমি দেশে ফিরবো না, নয় ত ম'রেই গেছি। তাই সুপাত্র পেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েচেন। কিন্তু এবার তোমাদের খবর বল শুনি।”

কাজল অপলকদৃষ্টিতে মিহিরের শান্তসুন্দর মুখের দিকে চেয়ে

ছিল। ছোটবেলায় সে মিহিরকে বড় ভালবাসতো, আজও সেই ভালবাসা ওর বুকে অক্ষয় হ'য়ে আছে তা নতুন ক'রে অনুভব ক'রলে। ব'ললে, "খবর আর কি? দিন কেটে যাচ্ছে। বাবা আর প'ড়তে দেবেন না, আমারও তাঁকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।"

মিহির উৎসুক হ'য়ে ব'ললে, "আর বিজলী? সে কেমন আছে?"

"ভাল আছে। ওরা এখন দিল্লীতে। দিদির একটি খোকা, আর সম্প্রতি একটি খুকু হয়েচে।"

"সত্যি? খুব সুন্দর নিশ্চয়?"

"খুকুকে দেখিনি; খোকা তার বাবার মত হয়েচে।"

মিহির চুপ ক'রে ভাবতে লাগলো—সেই বিজলী খোকা-খুকু সংসার নিয়ে আজো কি তাকে মনে করে?—"

কাজল ব'ললে "মিহিরদা, তুমি কোথায় আছ?"

"সম্প্রতি ট্রেন থেকে নেমেই তোমাদের বাড়ী আছি,—এবার একটা আস্তানা খুঁজে নেবো।"

"ছি, ছি, এখানে থাকতে পারো না বুঝি? আমরা কি এতই পর!"

মিহির ভাবলে—সেই ছোট্ট কাজল সে এত কথা শিখলো কবে? ওর মনটা একটি অতীতের মধুর ভাবনায় ভ'রে গেল—দুই চোখে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

"কি, চুপ ক'রে রইলে যে? থাকতেই হবে এখানে। বাবা আসুন, আমি ব'লছি। সত্যি মিহিরদা, তোমায় দেখে ভারী ভাল লাগচে। মনে হচ্ছে আমাদের একঘেয়ে জীবনে একটা নূতনত্ব এল!"

মিহির সস্নেহে কাজলের দিকে তাকিয়ে ভাবলে—কত সুন্দর হয়েচে কাজল! ওর দিদির সৌন্দর্য্যে জ্বালা ছিল, সে জ্বালা তার হৃদয়ে যে দাহ উৎপন্ন করেচে এতকাল ধ'রে তার ক্ষত আজো মেলায়নি। কিন্তু কি স্নিগ্ধ কাজলের রূপ,—কি মধুর চাহনি, কি কোমল ব্যবহার! ইচ্ছা করে, এই সংসারের রৌদ্রে, উত্তাপে তার তপ্ত ললাটে ওর স্নেহের পরশখানি বুলিয়ে নিতে।

মেঘনাদ এলেন। মিহিরকে পেয়ে যেন ওঁর যৌবন ফিরে এল—যেন শশাঙ্ককে কাছে পেলেন। সমস্ত সন্ধ্যা তিনি শিশুর মত উল্লাস ক'রলেন।

"বাবা, তুমি এখানে থাকো, আমার কাছে থাকো। এ তো তোমারই ঘর।"

মিহির ব'ললে, "কিন্তু আমি যে শীগ্‌গির আবার আমেরিকায় যাবো ভাবচি।

"আচ্ছা সে যেয়ো'খন—যতদিন না যাও এখানে থাকো।"

আত্মীয়বন্ধুহীন মিহির এ স্নেহের ডাক প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারলে না—সম্মতি দিলে। মেঘনাদ ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন, "তোমার জিনিষপত্র কই?"—পাছে বিলম্ব করলে মত বদ্‌লে যায়।

মিহির ব'ললে, "ষ্টেশনে।"

মেঘনাদ তক্ষুণি লোক পাঠাতে ছুটলেন।

২১

কাজল সমস্ত প্রাণ দিয়ে মিহিরের সেবা ক'রতে চায়,—যেন ওর ভালবাসা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে মিহিরের সকল অভাব দূর ক'রবে। কিন্তু ভাবে, কেন উনি কিচ্ছু চান না—কেন ওঁর উদাসীনতা দূর হয় না, মুখে হাসি ফোটে না!

কাজল নিজের ওপর রাগ ক'রে—নিজের অক্ষমতায় লজ্জিত হ'য়ে ভাবে—দিদি থাকলে এমনটি হ'ত না—সে খুশী ক'রতে পারতো।

মিহির বোঝে কাজল ওকে সুখী দেখতে চায়, তবু সহজ হ'তে পারেনা, হাসিমুখে সেবা গ্রহণ করে না—মাঝখানে যেন বিজলীর দীপ্ত আঁখি শাণিত ছুরিকার মত হাসির ব্যবধান তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাজল ভোরবেলা মিহিরের ঘরে চা দিয়ে এসে বেলা দশটায় স্নানের তাগিদ দিতে গিয়ে দেখলে অভুক্ত খাবারে পিঁপড়ে ধরেচে, ঠাণ্ডা চায়ের রং ঘোলা হ'য়ে উঠেচে।—মিহির সেই কালো মোটা বইটা তখনো তন্ময় হ'য়ে প'ড়চে।

অভিমানে তার চোখে জল এল; "মিহিরদা, খাওনি কেন?"

"ওঃ বড় ভুল হ'য়ে গেছে তো!"—মিহির বহুযত্নে সাজানো খাবারের রেকাবিটির দিকে চেয়ে রইল।

ভুল? কেন ভুল হয়?—কি এত চিন্তায় মিহির মগ্ন থাকে? কাজলের ইচ্ছা করে তার মনের ভেতরটা খুলে দেখে!

মিহির ব'ললে "রাগ ক'রোনা কাজল, এখুনি সব খাবারগুলো শেষ করে ফেলচি।"

সান্ত্বনার বচনে হঠাৎ কোথা থেকে কাজলের মনের মধ্যে একটা প্রবল অভিমান এসে উপস্থিত হ'ল; ব'ললে, "না, না, তোমায় খেতে হবে না, দাও আমার হাতে।" ঝর-ঝর ক'রে তার চোখ দিয়ে জল ঝ'রে প'ড়লো। মিহির স্তব্ধ হ'য়ে মুখের পানে চেয়ে রইল—একটি কথাও তার মুখে এল না।

কাজল দুঃখিত হয়েচে মনে ক'রে অবিলম্বে স্নানের ব্যাপার সেরে মিহির খাবার ঘরে গেল। কিন্তু কাজলের আসন শূন্য! সে প্রতিদিন মিহিরকে কাছে ব'সে খাওয়ায়—নইলে এ অন্যমনস্ক মানুষটির পেট ভরবে না তা জানে।—চাকরকে প্রশ্ন ক'রে মিহির জানলে—"দিদির অসুখ করেচে।"

মিহির মনে মনে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। অসুখ? কি অসুখ ক'রল আবার? খোঁজ নিতে হবে তো!

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে গিয়ে একটা নামজাদা বিদেশী উপন্যাস খুলে বসলো,—কোনো কথাই মনে রইল না। পড়তে পড়তে কোন এক নায়িকার ব্যথায় যখন মনটা আকুল হ'য়ে উঠেচে, মনে প'ড়লো বিজলীর কথা। বিজলী

কেমন আছে ! আচ্ছা বিজলী সুন্দর, না কাজলী সুন্দর? বোধ হয় বিজলীই সুন্দর !—হঠাৎ বিজলীর সমস্ত সৌন্দর্য্য ছাপিয়ে অশ্রুভরা দুটি কালো চোখ মনে প'ড়লো—আজ সকালে কাজল এখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে গেছে !

সমস্ত দুপুরটা একটি মধুর আলস্যে কেটে গেল,—কাজলের খবর নেবে নেবে ক'রেও আর নেওয়া হ'ল না। বিকেলে যখন কাজলের বদলে লক্ষ্মীবুড়ী চা নিয়ে এল তখন মিহিরের খেয়াল হ'ল; ব'ললে, "কাজল কেমন আছে? ওকে একবার ডেকে দেবে লক্ষ্মী?"

বহুক্ষণ কেটে গেল—কাজল এল না। কাজল আসবে না মনে ক'রে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে যাবে এমন সময় ঘরে ঢুকলো কাজল। মিহির দেখলে আজ বিশেষ ক'রে সে সেজে এসেচে !—পরণের বাসন্তী রং-এর সাড়ী, খোপায় গোঁজা শ্বেতকরবীর গুচ্ছ—এই গোধূলির আলোতে তাকে অপরূপ ক'রে তুলেচে।

অভিমানের সুরে কাজল ব'ললে, "কেন ডেকেচ?"

মিহিরের ইচ্ছা হ'ল সেই ছোটবেলার মত কাজলকে কাছে টেনে নেয়;—ব'ললে, "অসুখ করেচে?"

"সে খোঁজে তোমার দরকার কি?"

"কিছুই না—তবু আমি তোমার অতিথি, খোঁজ নিলে দেখায় ভাল।"

"ওঃ অতিথি"—কাজল উঠে যাবার চেষ্টা ক'রলে !

"ব'স না একটু কাজল, যদি ইচ্ছে করে, যদি কোনো কাজ না থাকে !"

কাজল অশ্রুনদীতে শক্ত ক'রে বাঁধ দিয়ে এসেছিল, যেন ভেতরের জল বাইরে এসে না পড়ে,—কিন্তু আর বাধা মানলো না, অঝোরে ঝ'রে প'ড়লো!

"কেন কাঁদচ কাজল? কি তোমার কষ্ট আমায় বল।"

কাজল মিহিরের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো,—মাটি যখন নরম তখন সামান্য ভরটুকুও সয় না।

"আমি কি তোমার জন্যে কিছু করতে পারিনে, কাজল?—"

কান্নায় গলার স্বর বুজে আছে, তবু কাজল ব'ললে, "সে তুমি বুঝবে না— ?"

মিহির কি বোঝেনি? তবু ধরা দিতে ভয় পায়! তার সন্ন্যাস-জীবনে দশবছর পূর্ব্বের এক বন্ধনের বেদনা আজও টন্ টন্ করে,—সেটুকু দূর ক'রতে পারলেই সে মুক্ত হয়—তার স্বাধীন মন নিয়ে জীবনের অসমাপ্ত কাজ শেষ ক'রে ফেলে। তাই এ নতুন আহ্বানে সে সাড়া দিতে চায় না—সাড়া দেবার শক্তিও বুঝি নেই।

বহুক্ষণ কেঁদে কাজল শান্ত হ'ল। মিহির ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ব'ললে,—"হয় তো বুঝতে পারিনি, হয় তো পেরেচি,—কিন্তু সত্যিই আমি বুঝতে চাইনে কাজল, আমি তার যোগ্য নই।"

কাজল ভাবলে মিহির তার বাগদত্তা বধূকে এখনো ভুলতে পারে নি।

২২

দিনতিনেক পরে মেঘনাদ এক টেলিগ্রাম-হাতে অস্থির হ'য়ে ছুটে এলেন—"কাজল, সর্ব্বনাশ হয়েচে, দিদির খুব অসুখ!"

কাজল টেলিগ্রামটি প'ড়ে দেখলে—পিসিমার কঠিন অসুখ, সুবোধ মফঃস্বলে, বিজলী অবিলম্বে ওদের যেতে বলেচে!

কাজল জানতো মেঘনাদের হার্ট দুর্ব্বল, কোনো রকম উত্তেজনা ওঁর পক্ষে অনিষ্টকর, শান্তভাবে ব'ললে, "দিদি একা, তাই ভয় পেয়ে গেছে বাবা। বেশ তো, আমরা আজই রওনা হব।"

মেঘনাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মিহিরকেও যেতে রাজী হ'তে হ'ল,—তা ছাড়া তার মনের নিভৃত কোণে বিজলীকে দেখবার যে একটি আকুল বাসনা দমন করা ছিল—সুযোগ পেয়ে তা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলো।

সেই দিনই তিনজনে রওনা হ'ল। বড়মার জন্যে কাজলের মনে উদ্বেগের অন্ত ছিল না—কিন্তু পাছে মেঘনাদ ব্যস্ত হন, তাই শত আশ্বাসবাণী দিয়ে মা যেমন ছেলেকে ভোলায় তেমনি ক'রে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। মেঘনাদও গাড়ীর দোলানিতে শান্ত শিশুর মত ঘুমিয়ে প'ড়লেন।

কাজল উঠে ওধারের বেঞ্চে মিহিরের পাশে গিয়ে ব'সলো। কামরার বাতি নেবান ছিল—চাঁদের আলোও যথেষ্ট নয়, সেই

অস্পষ্ট আলোকের নিবিড়তায় কাজলকে অপূর্ব্ব রহস্যময়ী ক'রে তুলেছিল,—মিহির দুইচোখে সবিস্ময়ে ওকে দেখছিল।

আজকাল কাজলের বেদনা মিহিরের মন স্পর্শ করে, কিন্তু তবু সে সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পায় না। নীরবে সে কাজলের একটি হাত ধ'রলে, কাজল বাধা দিলে না। বহুক্ষণ কেটে গেল—কখন এক সময় মিহির কাজলের হাতখানি নিজের অধরে ছুঁইয়ে দিলে।

সচকিত হ'য়ে কাজল হাত ছাড়িয়ে ব'ললে, "আমি জোর ক'রে কিছুই চাইনে, মিহিরদা।"

২৩

বিজলী মিহিরকে দেখে যেমন আশ্চর্য্য হ'ল তেমনি স্বস্তিও বোধ ক'রলে।

মিহির দেখলে বিজলী অনেকটা মোটা হ'য়ে গেছে, সে এখন সংসারভারে অবনতা একটি ছোটখাটো গিন্নি,—খোকা-খুকুর মা—তার ভেতরে দশবছর আগেকার ওর মানসীটিকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

রোগীর অবস্থা দেখে সকলেই চিন্তিত হ'লেন—কাজল দুই-হাতে পিসিকে জড়িয়ে ব'ললে, "বড়মা দেখ, আমি এসেচি।"

পিসি একবার ক্ষণকালের জন্যে চোখ খুলে কাজলকে ও শিয়রে-বসা মেঘনাদকে দেখলেন, তারপর জ্ঞান হারালেন, কথা বলবার শক্তি রইল না।

* * * *

সন্ধ্যাবেলা বিজলী মিহিরকে তার ঘরে ডেকে পাঠালে ;—ব'ললে, "তুমি তো আমার ছেলে মেয়েকে, দেখনি মিহির?" ঘুমন্ত খুকুকে চুমু খেয়ে বিজলী বিছানায় শুইয়ে দিলে। "কী মিষ্টি ক'রে ঘুমচ্চে একবার দেখ, মিহির!—"

মিহির শুধু ব'ললে, "খুব সুন্দর।" আর কিছুই মনে এল না।

"ওদের যে কি ভালবাসি জানো না, মিহির, সন্তান যে মায়ের কি জিনিষ সে তোমরা বুঝবে না! তোমাকে হারিয়ে মনে

হ'য়েছিল সংসার আমার কাছে শূন্য হ'য়ে গেছে, এ জীবনে এই অনন্ত বেদনাই বুঝি সম্বল,—শান্তি যে এত সামনে ছিল তখন ভাবতেই পারিনি। তুমি আমার চোখ খুলে দিলে! তুমি দুঃখ দিয়েছিলে ব'লে—আজ সুখের গভীরতা যে কতখানি তা বুঝেচি।"

মিহির চুপ ক'রে শুনলে। এই তার সেই দশবছর আগেকার প্রিয়া! যার ব্যথাভরা মুখ মনে ক'রে সে দীর্ঘকাল অসহ্য অশান্তি ভোগ করেচে, যাকে নিজের হৃদয়ে স্বর্ণপ্রতিমার মত রেখে পূজা করেচে, সে আজ স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে তাকে একেবারেই ভুলে নিশ্চিন্ত!......কিন্তু তাই তো মিহির চেয়েছিল—সেদিন তার সর্ব্বান্তঃকরণ তো এই কামনাই করেছিল!

বিজলী ব'ললে "থাক পুরণো কথা, ওসব এখন ন্যাকামি ব'লে বোধ হয়। কেমন বউ হয়েচে।"

যা ছিল একদিন আবেগময় উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম, তা হয়েছে আজ ন্যাকামি! মিহির ব'ললে, "চমৎকার বউ।—"

"সুখী হয়েচ ?"

"খুব—"

"আমায় ভুলে যেতে পেরেচ ত ?"

"চেষ্টা করেচি।—"

"কিন্তু আমার কিছুই চেষ্টা করতে হয়নি, মিহির! বিয়ের পরেও তোমার চিন্তা আমায় অস্থির ক'রতো; তারপর খোকন কোলে এল—কখন কোন ফাঁকে দেখলাম তোমার কথা আমার মনের কোণেও জাগে না—এম্‌নি মায়ের মন!"

ঘুমন্ত মেয়েকে আবার আদর ক'রলে, তারপর গলার স্বর নামিয়ে বিজলী ব'ললে, "কাজলের জন্যই আমার ভাবনা, কারো

কথা শোনে না—নিজের যা খুশী তাই করে. দুটো তিনটে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলে। প্রদীপকে মনে আছে? ভুবনকাকার ছেলে—সে তো ওর জন্যে ঘরছাড়া সন্ন্যাসী! আমি জানি কাজলও তাকে পছন্দ ক'রতো—কিন্তু বিয়ের কথা ব'লতেই একেবারে আগুন হ'য়ে উঠলো। বাবার আদরেই এমন হয়েচে—"

মিহির বাধা দিয়ে ব'ললে, "এত কথা আমায় ব'লচ কেন?

"তুমি ওর দাদার মত—পার তো প্রদীপের সঙ্গে যাতে বিয়েটি হয় তার চেষ্টা ক'রো।—"

মিহির কথার মোড় ফিরিয়ে দিলে—"চল বড়মার ঘরে যাই, কাকা অনেকক্ষণ ব'সে আছেন।"

এ ঘর থেকে ছাড়া পেলে যেন ও বাঁচে—এখানকার হাওয়া যেন ওর নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দিয়েচে। বিজলী শান্তি পাক্, সুখে থাকুক, এই তো ওর চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা,—কিন্তু যখন সে নিজের মুখে শান্তির কথা আনন্দের কথা স্বীকার ক'রলে ওর সমস্ত মন বিরূপ হ'য়ে উঠলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, আমি মিথ্যে নিয়ে খেলেচি, ওকে আমি কোনোদিনই ভালবাসিনি—ওর ভালবাসা দেখে, দুঃখ দেখে কেবলমাত্র মনে করুণা জেগেছিল—সেটুকুই আজো অবশিষ্ট আছে।

২৪

রাত্রিজাগরণের ভার নিলে মিহির আর কাজল। ওরা দুজনে পালা ক'রে জাগবে। মেঘনাদ অসুস্থ, বিজলীর কোলে ছোট খুকু—কেউই এ কাজের যোগ্য নয়। কাজল বরফের ব্যাগ নিয়ে অর্দ্ধরাত্রির মত প্রস্তুত হ'য়ে পিসিমার মাথার কাছে ব'সলো; মিহির দূরে একটা বড় চেয়ারে শুয়ে ঘুমোবার ভাণ ক'রে সেবানিরতা কাজলের শান্ত মূর্ত্তিখানি দেখতে লাগলো। আজ সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও কাজলের ভালবাসা গ্রহণ ক'রতে চায়—তার এতকালের বুভুক্ষিত অন্তরে কি এক অনাস্বাদিত মধুর সন্ধান যেন পেয়েচে,—আজ বিজলীর কোন স্মৃতি সেখানে বাধা তুলে নেই।

রাত্রি গভীর হ'ল—মিহির চোখ বুজে ভাবছিল, ঘুম আসেনি। কাজল ওকে ঘুমন্ত মনে ক'রে একটা চাদর এনে পায়ের ওপর ঢেকে দিলে; মিহির চোখ বুজে কাজলের এই নীরব সেবাটুকু অনুভব ক'রে সুখী হ'ল। হঠাৎ পিসিমা চোখ মেলে চাইলেন—কাজল ঝুঁকে প'ড়ে ওঁকে দেখছিল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "কাজল!"

মিহিরের তন্দ্রা ভেঙ্গে গিয়েছিল, সাম্‌নে এগিয়ে এল—রোগীর মুখে একটু ফলের রস দিয়ে দিলে। পিসিমা আবার ব'ললেন,—"কাজল!"—এবার গলার স্বর অনেকটা পরিষ্কার।

"কি বড়মা ? কিছু ব'লবে ?"

"ব'লবো মা, ব'লবো—সেই বলার শক্তিটুকু তোরা দে আমায়—"

"কিছুক্ষণ পরে ব'লো বড়মা, একটু সাম্‌লে নাও।"

"সময় ফুরিয়ে এসেচে মা,—অপেক্ষা ক'রলে চ'লবে না! অশান্তি আমার তোর জন্তেই হচে ; তুই প্রদীপকে বিয়ে ক'রতে অমত করিসনে মা, সে তোর জন্তে বাড়ী ছেড়ে মা-বাপকে ফেলে রাজদ্রোহীদের দলে মিশেচে—দু'বছর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি—হয় তো বা জেলেই আছে। তুই কি মনে করিস—এ অপরাধ তোর নয় কাজল ?—"

অনেক কথাই কাজলের মুখে এসেছিল, কিন্তু কিছুই ব'লতে পারলে না—পিসিমাও শ্রান্ত হ'য়ে চোখ বুজে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার সচেতন হ'য়ে মিহিরকে কাছে ডাকলেন। "বাবা মিহির, কাজলের মা নেই—ছোটবেলা থেকে সে অবুঝ—আমরা তাকে কিছুই শেখাইনি। তুমি ওকে এ অন্যায় থেকে রক্ষে কর। প্রদীপকে খুঁজে বের ক'রে ওর হাতে কাজলকে দিও, নইলে আমার ম'রেও শান্তি নেই।—"

মিহির কাজলের মুখের দিকে চাইলে।

কাজল স্থিরদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকেই চেয়ে ছিল—সে চাহনিতে মিহিরের শান্ত অন্তরে যেন কালবৈশাখীর উদ্দাম নৃত্য উঠলো—। ব'ললে, "পিসিমা, আপনি স্থির হোন—কাজল যাতে সুখী হয় আমরা সকলেই তার চেষ্টা ক'রবো।"

পিসিমা শান্ত হ'য়ে আবার চোখ বুজলেন।

শেষরাত্রে তাঁর শ্বাসকষ্ট বাড়লো—বাড়ীর সকলেই উঠে এসে

চারিদিকে ঘিরে ব'সলো—সুবোধও টেলিগ্রাম পেয়ে এসে পৌঁছেছিল। ডাক্তারবাবু ঘরের বাইরে চ'লে গেলেন।

মিহির হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সব জানালাগুলো খুলে দিয়ে মৃদুস্বরে ব'ললে, "সব শেষ!"

বিজলী ও কাজল কেঁদে উঠলো,—মেঘনাদ আকুল হ'য়ে দিদির প্রাণহীন দেহ জড়িয়ে ধ'রলেন।

তখন ভোরের পাখী ডাকতে সুরু করেচে।

২৫

পিসিমার মৃত্যুর পরে পনেরো দিন কেটে গেল। মেঘনাদ এই বৃদ্ধ বয়সে মাতৃস্থানীয়া দিদির শোক কিছুতেই সাম্‌লে উঠতে পারলেন না, অসুস্থ হ'য়ে তাঁকে কিছুদিন দিল্লীতেই আশ্রয় নিতে হ'ল। কাজলী কখনো মায়ের স্নেহ পায়নি, শিশুকাল থেকে সে পিসির কাছে মায়ের অধিক আদর-ভালবাসা পেয়েচে, আজ তিনি নেই—এই গভীর আঘাত কাজলের কোমল হৃদয় ভেঙ্গে দিলে,—সে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হ'তে পারছিল না।

ক'লকাতায় ফিরে আবার নিজের নীড়টির ভেতর ও যদি শান্তি পায় ভেবে মেঘনাদ ফেরবার জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠে-ছিলেন। সুবোধ ও বিজলীর অনুরোধে, মিহিরও যাই যাই ক'রে যেতে পারছিলো না,—শেষ পর্য্যন্ত মেঘনাদের সঙ্গেই ওর ফেরা ঠিক হ'ল।

ক্রমে যাবার দিন এসে প'ড়লো। বিজলী মিহিরকে ব'ললে, "কালই তো তোমরা চ'লে যাচ্ছ,—কাজলটার এখানে এসেও কিছুই দেখা হ'ল না—ওঁর সময় নেই—বাবার অসুখ, আমি তো খুকিকে নিয়ে নড়তে পারিনে—গাড়ীটা তো প'ড়েই আছে, ওকে অন্ততঃ কুতবটা দেখিয়ে আনবে, মিহির?"

মিহির আপত্তি ক'রলে না—কিন্তু কাজলকে বাড়ী থেকে বা'র ক'রতে বিস্তর বেগ পেতে হ'ল। অবশেষে মিহিরের কাতর দৃষ্টিতে, মেঘনাদের অনুরোধে সম্মতি দিলে।

সন্ধ্যার কিছু আগে তারা কুতবে পৌঁছলো। দর্শকরা তখন সকলেই বাড়ী ফিরে গেছে—স্থানটা জনশূন্য—কুতবের সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে পাশাপাশি দু'জনে সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠলো।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেচে। উদ্দাম হাওয়া কাজলের আঁচল ও চুলের গুচ্ছ উড়িয়ে দিয়ে তাকে অস্থির ক'রে তুললো। কাজলের মনে হ'ল তার ভিতরেও এক তাণ্ডব সুরু হয়েচে;—ব'ললে, "এমন ভাল লাগচে—মনে হচ্চে তুমি যদি—", কি ব'লতে গিয়ে কাজল সাম্‌লে গেল।

মিহির অন্য দিনের মত আজ নির্ব্বিকার হ'য়ে থাকতে পারলে না; ব'ললে, "আমারও ভারী ভাল লাগচে কাজল, আমারও মনে হচ্চে তুমি যদি—"

কাজল ব'ললে, "মিহিরদা, আমি কিন্তু জানি তুমি দিদিকে ভালবাসতে; হয় তো এখনো বাসো। আমি দিদির পুরণো ডায়েরী-খাতা থেকে সে খবর আবিষ্কার করেচি।"

"সত্যিই ভালবাস্‌তুম কাজল। আমার প্রথম যৌবনে সে এসেছিল তার বুকভরা ভালবাসা নিয়ে,—সেদিন ওকে দিয়েছিলুম উপেক্ষা আর বেদনা—ভালবাসা গ্রহণ করিনি বাগ্‌দত্ত ছিলুম ব'লে; কিন্তু গ্রহণ করিনি ব'লেই অতৃপ্তিতে আমার মন ভ'রে ছিল,—ওর বেদনা আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধেচে। কিন্তু আজ আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই,—সে আমায় অনেক দিন ভুলে গেছে, স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখী হয়েচে। নিজের পানে তাকিয়ে দেখি, আমারও তাতে ক্ষোভ নেই, অশান্তিও নেই—। তোমার ভালবাসারই জয় হ'ল কাজল!—তুমি আমাকে এমন ক'রে টানলে যে আমার ব'লে আর কিছুই রইল না।"

কাজলের বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। কি করবে, কি ব'লবে যেন ভেবে পেলে না,—আকণ্ঠ তার সুধায় পূর্ণ হ'য়ে গেছে, তাই বুঝি বাণীরও ঠাঁই নেই!

মিহির কাজলীর নত মুখখানা দুই হাতে তুলে ধরলে,—আদর ক'রে কাছে টেনে এনে তার কোমল ওষ্ঠে নিজের তৃষিত অধর স্পর্শ ক'রলে। তারপর দু'জনে হাত-ধরাধরি ক'রে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

২৬

ক'লকাতা ফিরে মেঘনাদ মিহিরকে ব'ললেন, "বাবা, ভুবন-বাবুর চিঠি পেয়েচি ; তিনি একটি দুরূহ ভার আমায় দিয়েচেন। প্রদীপকে খুঁজে বের ক'রতে হবে।"

নিজের আনন্দে মত্ত হ'য়ে মিহির প্রদীপের কথা ভুলে গিয়েছিল ভেবে লজ্জিত হ'ল। যে কাজলকে এত অল্পদিন ভালবেসে সে এত তৃপ্ত এত মুগ্ধ হয়েচে, সেই কাজলকে যে শিশুকাল থেকে ভালবাসে তার দাবীও বড় কম নয় সেটা বুঝলে ;—ব'ললে, প্রদীপের দলের কয়েকটা আস্তানা আমার জানা আছে কাকা, সেখানে খোঁজ ক'রবো—"

"হ্যাঁ, বাবা, তাই কর, তারপর একদিন শুভক্ষণে প্রদীপের হাতে কাজলকে সমর্পণ ক'রতে পারলেই আমার সমস্ত কাজ শেষ হয়,—শৈল-র কাছে যাবার ছুটি পাই।"

মিহির নিজের ভালবাসা স্বীকার করবার পর কাজলের মনটি এমন সহজ তৃপ্তিতে ভ'রে গেল যে তাই নিয়ে আপন অন্তরে একটি কল্পজগৎ সৃষ্টি ক'রে সে আনন্দে বিভোর হ'য়ে থাকতো। পাছে বেশী ব্যক্ত হ'লে তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সেই ভয়ে সে দূরে দূরে থাকতো, সহজে মিহিরের কাছে আসতো না।

মিহিরের তাতে দুঃখ ছিল না, সমস্ত দিনের মধ্যে কাজলের নীরব সেবা অনুভব করতো সে। দ্বারের কাছে চুড়ির কিম্বা চাবির মৃদু শব্দে সচকিত হ'য়ে দেখতো—কাজল একটি দুষ্টু চাহনি, একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে পালাচ্চে; তখন তার মনের বীণা নানা সুরে বেজে উঠতো।

কাজল প্রতিদিন কোন ফাঁকে এসে তার ঘরটি আপন হাতে পরিষ্কার ক'রে ফুল দিয়ে সাজিয়ে যেত, মিহির টের পেত না, কিন্তু ফুলের সৌরভে তার সারাটি মন আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতো।

মেঘনাদের সঙ্গে কথা হওয়ার পর সে কাজলকে ডেকে পাঠালে। কাজল নববধূর লজ্জা নিয়ে ওর ঘরে এল। মিহির ব'ললে, "প্রদীপের কোনো ছবি কি তোমার কাছে আছে, কাজল?"

কাজল অবাক্ হ'য়ে ব'ললে, "কেন?"

"তার চেহারাটা ভাল মনে প'ড়চে না—তাকে খুঁজে বের ক'রতে হবে।"

মিহিরের উদারতায় কাজলের সমস্ত মন শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠলো; ব'ললে, "ছবি এলবামে থাকতে পারে, ছোটবেলার চেহারা।"

মিহির ব'ললে, "তাতেই চ'লবে।"

"আহা, খুঁজে যেন পাও! আমরা দু'জনে তাকে ভাল-

বাসবো—তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী ক'রবো—তার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়।"

মিহির হাসলে। "প্রদীপ এসে যদি তোমাকে কেড়ে নেয় কি ক'রবো বল তো, কাজল? 'ডুয়েল' লড়তে রাজী আছি, হবে ত?—না প্রদীপকেই পছন্দ ক'রে নেবে"?

"ইস্" ব'লে কাজল চ'লে গেল। এতবড় অঘটন সে কল্পনাও ক'রতে পারে না, তাই মনে কোনো আশঙ্কাও নেই। কিন্তু মিহিরের মন অত নিশ্চিন্ত নয়—প্রদীপকে খুঁজে বের করা তার কর্ত্তব্য তা' সে বোঝে, সঙ্গে সঙ্গে কাজলকে হারাবার ভয়ও প্রতি মুহূর্ত্তে তার মনে জেগে ওঠে। বুঝতে পারে না, কাজল তার জীবনে আনন্দের প্রেরণা—না প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা।

মিহির অনেক খুঁজেও প্রদীপকে বের ক'রতে পারলে না। ক'লকাতার মত বড় সহরে যে ইচ্ছা ক'রে লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এদিকে মেঘনাদ ক্রমশঃই দুর্ব্বল ও অশক্ত হ'য়ে প'ড়চেন—শেষে শয্যা নেবার অবস্থা প্রায় হ'ল।—জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেচে বোঝেন, তাই কাজলের কথা ভেবে আরও অস্থির হ'য়ে ওঠেন।

কাজল একদিন মিহিরকে ব'ললে—"বাবার শরীর ক্রমেই বেশী খারাপ হচ্চে, আমার চিন্তা আরো ওঁকে ব্যস্ত ক'রচে। তুমি যে আমায় গ্রহণ করেচ সে কথা ওঁকে বলনা এবার।"

মিহির ব'ললে, "কিন্তু প্রদীপ? তার জন্যে আরো কিছুদিন অপেক্ষা ক'রলে হয় না?"

"কেন তার জন্যে কি আট্‌কাচ্চে? তুমি কি আমায় তার হাতে দেবে নাকি?—"

রাগ ক'রে কাজল চ'লে গেল।

মিহির বুঝলে আর দেরী করা ঠিক নয়, নিজের মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে সে মেঘনাদের ঘরে উপস্থিত হ'ল।

তার মুখে সংক্ষেপে সমস্ত কথা শুনে আনন্দের উত্তেজনায় মেঘনাদ উঠে ব'সলেন, তাঁর চোখে জল এল! এতবড় সৌভাগ্য যে তাঁর এত নিকটেই ছিল আগে তার সন্ধান পাননি ব'লে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। কাজলকে ডাকিয়ে এনে তিনি উচ্ছ্বসিত-মনে উভয়কে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন।

২৭

হাওয়ার মত হালকা মন নিয়ে মিহির বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল ; সেদিনের আনন্দ তাকে ঘরের মধ্যে স্থির থাকতে কিছুতেই দিলে না। সারাদিন এখানে ওখানে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে অবশেষে শিবপুর বাগানে যখন এসে পৌছলো, বেলা তখন শেষ হ'য়ে এসেচে।

ক্লান্ত শরীরে মিহির একটা বেঞ্চের ওপর ব'সে প'ড়ে অন্যমনস্ক-চোখে অনতিদূরে একটি ছেলের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখটা ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিলো না, সে ঘাসের ওপর বুকে ভর দিয়ে শুয়ে একটা খাতায় কি লিখছিলো। এমনই তন্ময় হ'য়ে সে লেখায় মগ্ন যে, মিহিরের আগমন টেরই পেলে না।

দিন শেষ হ'ল,—সূর্য্য পশ্চিমে হেলে প'ড়লো, ছেলেটি লেখা বন্ধ ক'রে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে কার উদ্দেশে নীরবে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটির মুখ চোখে প'ড়তেই মিহিরের অনেকদিনের দেখা একখানি কিশোরসুষমার মুখ মনে প'ড়ে গেল,—ভাল চিনতে পারলে না। কিন্তু ছেলেটি এগিয়ে এল ; ব'ললে, "আপনি মিহিরবাবু, না? আমি প্রদীপ।"

মিহির চম্‌কে উঠলো! এই প্রদীপ? যাকে সে এতদিন ক'লকাতার অলিতে-গলিতে খুঁজে বেড়িয়েচে—সে এসে আজ নিজে ধরা দিলে! ব'ললে, "কোথায় ছিলে, প্রদীপ? এ কি চেহারা হয়েচে তোমার?"

রক্তশূন্য ফ্যাকাসে কপালের ওপর থেকে রুক্ষ চুলগুলো শীর্ণ

হাতে সরিয়ে প্রদীপ ব'ললে, "কিছুকাল থেকে জ্বরে ভুগচি। জ্বর যখন চেপে আসে বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ করি,—জ্বর ছেড়ে গেলে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে বসি। সমস্ত জীবনে এত ক্লান্ত হয়েচি তবু ছুটি মঞ্জুর হ'ল না—"

"কেন এমন ক'রে শরীরকে কষ্ট দিচ্চ, প্রদীপ? তোমার মা-বাবা কত দুঃখ করেন,—কাজল কত দুঃখ করে।"

"কাজলী?—তার খবর তুমি জান?"

"জানি বই কি—সে তোমায় কত খুঁজেচে।"

"না,না,মিহিরবাবু,তুমি মিথ্যে ব'লচ,—সে আমায় চায় না—"

মিহির স্নেহের স্বরে ব'ললে, "যদি জানো চায় না—তবে কেন তুমি তার আশা ছেড়ে দাও না?"

"আশা ছাড়বো? তুমি বল কি মিহিরবাবু, তাকে কি আজ থেকে চাইচি? সেই ছোটবেলায় যখন থেকে জ্ঞান হ'য়েচে, যখন থেকে ভালবাসতে শিখেচি, তখন থেকে তাকে চাই। যদি বেঁচে থাকি এখনো যে চাইতে পারছি এই আনন্দে বেঁচে থাকবো —যদি ম'রে যাই, মৃত্যুর পরেও চাইবো। এই যে খাতা দেখচো —এতে কেবল তারি কথা কবিতায় গেঁথেচি। সে আমার সন্ধ্যামণি—তাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারিনে, মিহিরবাবু।"

মিহির চুপ ক'রে শুনলে—এতো রোগীর প্রলাপ নয়—এযে সমস্ত প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে ব'লচে! মিহির অনেক কথাই বলবার চেষ্টা ক'রলে কিন্তু কিছুই পারলে না;—শুধু ব'ললে, "চল প্রদীপ, আমি তোমায় কাজলের কাছে নিয়ে যাই।"

প্রদীপ শিশুর মত খুশী হ'য়ে উঠলো। "সত্যি আমায় নিয়ে যেতে পারো, মিহিরবাবু? তা হ'লে চল!"

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েচে, মিহির তখনো বাড়ী ফেরেনি। তার সকালের অভুক্ত আহার প'ড়ে আছে,—সেই যে মনের খুশীতে বেরিয়ে গেল, এখনো আসেনি। অধীর প্রতীক্ষায় কাজল ব'সে আছে—রাস্তায় প্রত্যেকটি পথিকের পায়ের শব্দে চম্‌কে উঠচে। এমন সময় মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে। "কাজু, দেখে যা মিহির কাকে ধ'রে এনেচে।"

কম্পিতহৃদয়ে কাজল নীচে গিয়ে দেখলে রুক্ষকেশ, মলিনবসন অস্থিচর্ম্মসার প্রদীপ মিহিরের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে। কাজলকে দেখেই অস্ফুট স্বরে কি ব'লতে গিয়ে মিহিরের কাঁধে মাথাটা ঢ'লে প'ড়লো।

মিহির গম্ভীর স্বরে ব'ললে, "কাজল, চল একে শুইয়ে দিই। —প্রদীপ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।"

কাজল একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে মনে শক্তিসঞ্চয় ক'রে নিলে—তারপর মিহিরের সাহায্যে প্রদীপকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

বিছানায় শুইয়ে মাথায় বরফজল দিয়ে পাখা খুলে বহু পরিচর্য্যার পর যখন প্রদীপের জ্ঞান ফিরে এল, তার আগেই মিহির ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রদীপ চোখ মেলেই ব'ললে, "কাজলী!"—আদরে, অভিমানে

সে কতদিন পরে কাজলকে ডাকলে,—করুণায় কাজলের মন পূর্ণ হ'য়ে গেল। সেই প্রদীপ—কতকালের বন্ধু,—শিশুদিনের খেলার সাথী প্রদীপ! মনে প'ড়লো, একটি সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথ, টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি প'ড়চে, অন্ধকার রাত্রি—তারি ভিতরে প্রদীপের হাত ধ'রে সে চলেচে একান্ত নির্ভয়ে শিশুহৃদয়ের সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে। প্রদীপের কপালে হাত বুলিয়ে ব'ললে, "প্রদীপ, নিজেকে এমন ক'রে কষ্ট দিতে আছে, ভাই?"

প্রদীপের চোখের কোলে কোলে জল ভ'রে এল;—ব'ললে, "আমি বেশীদিন বাঁচবো না, কাজলী,—তুমি আমায় এই ক'টাদিন ভালবাসো।"

কী মিনতি তার কণ্ঠস্বরে—কাজলের বুকেও ব্যথা গুমরে উঠলো! ব'ললে, "তোমায় তো আমি ভালবাসি,—ভগবান জানেন তোমায় কত স্নেহ করি, কত বিশ্বাস করি।"

"তুমি স্থির হ'য়ে থাক—বড় দুর্ব্বল হয়েচ, আর কথা ব'লো না, এসো আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।"

প্রদীপ পরম আনন্দে অসীম তৃপ্তিতে চোখ বুজলে। সে ঘুমুবে, কাজলী মাথার কাছে ব'সে থাকবে; এ তার সমস্ত যৌবনের সুমধুর স্বপ্ন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে প'ড়লো। নীচে মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"লক্ষ্মী, দুধ গরম হয়েচে—এখুনি একপেয়ালা প্রদীপের জন্যে দিয়ে এসো।"

কাজল দেখলে একটি কালো খাতা প্রদীপের হাতের তলে চাপা রয়েচে,—অজ্ঞান অবস্থাতেও হাত থেকে সেটি খ'সে পড়েনি। কৌতূহলবশে খুলে দেখলে, কবিতা—অসংখ্য কবিতা—সন্ধ্যামণিকে

উৎসর্গ করেচে।—প্রত্যেকটি কবিতা ব্যথার অশ্রুজলে বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। ভালবাসায় যে কী অপরিমিত বেদনা সে মিহিরকে ভালবেসে বুঝেছিল, তাই প্রদীপের দুঃখ তার মনের দুয়ারে ঘা দিল,—সমস্ত মন ব্যথায় কোমল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু মিহির কই ?—কাজল তো তাকে বহুক্ষণ দেখেনি—সে কি বিশ্রাম ক'রচে ? আহা আজ সারাদিন সে কত ক্লান্ত ! লক্ষ্মী আসতেই তাকে প্রদীপের কাছে বসিয়ে সে মিহিরের সন্ধানে গেল।

ঘর শূন্য—বাতি জালান রয়েচে,—বাগানের দিকের দরজাটি খোলা, দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে হু-হু ক'রে বাতাস এসে কাপড় চোপড়, টেবিলের কাগজ পত্র উড়িয়ে নিচ্চে !

কাজল দরজা বন্ধ ক'রে টেবিলের কাগজ পত্র গুছিয়ে রাখতে গেল। দেখলে, তার নিজের নামলেখা এক চিঠি মিহিরের হস্তাক্ষরে।—ওর মনটা চমকে উঠলো—মিহির কি লিখেচে ? কি লিখেচে ? অধীর হৃদয়ে চিঠিটা খুলে প'ড়লে—

কল্যাণীয়াসু,

তোমায় যে কত ভালবাসি, তা' আজ তোমায় ছেড়ে যাবার সময় আরো ভাল ক'রে বুঝলুম। তোমার ভালবাসা আমার মাথার মণি—তবু সে আমার নয়—তাই নিয়ে প'ড়ে থাক্‌লে চ'লবে না। প্রদীপের কথা ভাবতে হবে। সে মরতে বসেচে কেবল তোমারই জন্যে। তার কবিতার খাতাটি দেখলে বুঝবে, কত গভীরভাবে সে তোমাকে ভালবাসে। আমি আমার নিজের মন দিয়ে জানি সত্যিকারের ভালবাসার গভীরতা কতখানি ;— তার বেদনা অসীম।

তোমাকে ছেড়ে যেতে কি কষ্ট হচ্চে না? তুমি জানো কাজল, আজ সকালেই কি অতুল্য সুখের অধিকারী হ'য়েছিলাম। আমার মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই,--এ সারা দুনিয়ায় তুমি ছাড়া কেউ নেই। তুমি আমার শূন্য গৃহে লক্ষ্মী হ'য়ে আসবে—আমার কল্পনায় নয়, স্বপ্নে নয়—সত্য জীবনে আজ সেই আনন্দের বারতা এসে পৌঁছেছিল। মনে ক'রেছিলুম জীবনের বাকি ক'টাদিন তোমার অঞ্চলের ছায়ায় শান্তির আশ্রয়ে কাটিয়ে দেব—কিন্তু বিধাতার বিধি অন্যরকম—আমায় চ'লে যেতে হবে। প্রদীপের দাবী আমার চেয়ে অনেক বেশী—সে শিশুকাল থেকে তোমাকে ভালবাসে। সে তোমার ভালবাসা পেলে বাঁচবে। তার তরুণ জীবন দলিতফুলের মত শুকিয়ে যাচ্চে, তুমি তাকে ভালবাসা দিয়ে আবার ফুটিয়ে তোল। সেই হবে আমার পুরস্কার।

বড় কঠিন পরীক্ষায় তোমায় ফেলে চলেছি কাজল,—তবু জানি তুমি পারবে, হয় তো একদিন তোমার দিদির মতই সুখী হবে। আমার জন্যে ভেব না—আমার কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত—আমেরিকায় অসমাপ্ত কাজ রেখে এসেচি, তাই নিয়ে আমার দিন কেটে যাবে—আনন্দে না হোক্—দুঃখেও নয়। উপস্থিত জমিদারীতে যাচ্চি। যতদিন না মন প্রস্তুত হয় তুমি আমায় ডেকো না, কাজল, দেখা দিতে ব'লো না।—জেনো, আমি দূরে থাকলেও তোমায় ভুলে থাকবো না—তোমার ভালবাসা যা' পেয়েচি তা' আমার বাকি জীবনের পাথেয়। আমার ভালবাসা আমার শুভ-কামনা তোমায় চিরজীবন ঘিরে থাকুক্।

মিহির

রুদ্ধনিঃশ্বাসে কাজল চিঠিখানা প'ড়লে, তারপর মিহিরের পরিত্যক্ত শয্যার উপর লুটিয়ে প'ড়ে কেঁদে উঠলো—এ কি শাস্তি আমায় দিলে !—এ আমি পারবো না—আমার বুক ভেঙ্গে যাবে—তবু পারবো না !

সকালবেলা নিজের হাতে যে মালাটি গেঁথে মিহিরের ছবিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল—হাওয়ায় সেটি খ'সে পড়লো তার মাথায়, মিহিরের সান্ত্বনার মত।

২৯

একমাস অক্লান্ত নিষ্ঠায় কাজল প্রদীপের সেবা ক'রে তাকে বাঁচাবার পথে টেনে আনলে।

মিহির চ'লে যেতে মেঘনাদ একেবারে ভেঙ্গে প'ড়েছিলেন' কাজল শুধু ব'লেছিল, "তিনি আমায় প্রদীপের হাতে সঁ'পে গেছেন বাবা।"

মেঘনাদ উত্তেজিত হ'য়ে ব'লেছিলেন, "সে কেমন ক'রে হবে? আমি জানি সে তোকে নিজের জীবনের চেয়ে ভালবাসতো।"

শান্ত সুরে কাজল ব'লেছিল, "প্রদীপও তো আমায় কম ভালবাসে না, বাবা!"

মেঘনাদ হতাশ হ'য়ে ভেবেছিলেন—এমন ক'রে বিপদ ঘনিয়ে আসে কেন? মেয়েটাকে দু'টুক্‌রো ক'রে ভাগ করে দিতে ত পারিনে!—

প্রদীপ ভুবনবাবুকে তার অসুখের সংবাদ জানাতে দেয়নি; ব'লেছিল, "আমাকে দয়া ক'রে একটা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন—যদি বেঁচে উঠি তবেই আবার বাবা মার কাছে মুখ দেখাবো। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেচি, সে আজ অনেকদিন—তাঁদের কাছে তো মৃত হ'য়েই আছি—আর নতুন ক'রে দুঃখ দিই কেন?—"

ডাক্তার কাজলকে নিভৃতে ডেকে ব'লেছিলেন,—"আপনি যখন সেবার ভার নিয়েচেন তখন খুলে বলি, রোগীর প্রফুল্লতাই এক-

মাত্র ওষুধ। অতিরিক্ত মানসিক অবসাদে এ-রকম অবস্থা হয়েচে, সেটি যদি দূর করা যায়—তবে ওষুধের চেয়ে ভাল ফল হবে।"

শিউরে উঠে কাজল ভেবেছিল, আমার হাতেই কি তার বাঁচবার উপায়? বিধাতা আমায় এমন ক'রে পরীক্ষা ক'রচেন কেন?

প্রতিদিন ভোরবেলা সে মিহিরের ছবির কাছে নত হ'তে প্রণাম ক'রে ব'লতো—"তোমার কাছে এ জীবনে আর কিছুই চাইবার নেই, কেবল আশীর্ব্বাদ ছাড়া—তুমি আমায় শক্তি দাও—এ দুর্ব্বল মন আর পেরে উঠচে না!"

দীর্ঘ একমাস পরে প্রদীপ যেদিন অজ্ঞান অবস্থা থেকে সহজ অবস্থায় ফিরে এল—সেদিন সকালে কাজল তার মুখ মুছিয়ে রুক্ষ চুল ঠিক ক'রে সাজিয়ে জানালা খুলে দিয়ে পাশে এসে ব'সলো। শরতের সকালবেলার সোনালি আলোয়—বহুরাত্রি জাগরণে ক্লান্ত, সেবা-নিরতা কাজলের মূর্ত্তিখানি প্রদীপ নতুনভাবে দেখলে। এ রূপ যেন তার চিরপরিচিত কাজলের নয়—এ যেন তপঃক্লিষ্টা উমা ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে আছে।—প্রদীপ দুইচোখ ভ'রে কাজলকে দেখতে লাগলো!—

স্নেহের সুরে কাজল ব'ললে, "এখন কেমন আছ, প্রদীপ?—"

"খুব ভাল আছি; কিন্তু কেন তুমি আমায় বাঁচালে, কাজলী? —আবার তো সেই দুঃখ, সেই তোমায় না পাওয়ার দুঃখ—! আমার নিঃসঙ্গ একা জীবন—"

কাজল ব'ললে, "সত্যি কি তোমার আর কোন আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই—কেবল আমাকেই চাও?"

"তাই চাই কাজলী! যদি তোমায় পাই আবার মানুষ হব—

আবার আশা জাগবে, আকাঙ্ক্ষা জাগবে—তোমার হাত ধ'রে জীবনের পথে গান ক'রতে ক'রতে চ'লবো।—"

"একি তুমি ব'লচ—না তোমার কবি-মন ব'লচে?—প্রদীপ, আমায় ভয় করে, তুমি কাব্যজগতের মানুষ—কল্পনা নিয়ে তোমার কারবার—আমাকে ভালবাসা তোমার একটা সৃষ্টি—নয় ত একটা ক্ষণকালের খেয়াল?"

"না কাজলী, এ জন্ম-মৃত্যুর মত সত্য, সূর্যের উদয়-অস্তের মত। আমার জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।"

খোলা জানলা দিয়ে এক দম্‌কা শেফালি-সুগন্ধি-হাওয়া ভেসে এল—কাজলের রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে মুখে এসে প'ড়ল—চুপ ক'রে সে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তার মনের আকাশে যে একটি করুণ দৃষ্টি সন্ধ্যাতারার মত ফুটেছিল—আজ এই শরতের আলোয় তা যেন ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল। বহুক্ষণ পরে কাজল ব'ললে, "তোমার ভালবাসা দিয়ে আমায় তোমার যোগ্য ক'রে নিও প্রদীপ! আমার মনটা একটা পোড়ো বাড়ীর মত হ'য়ে আছে, তাকে কলি ফিরিয়ে রং লাগিয়ে নিতে সময় লাগবে।"

প্রদীপ কাজলের হাতটা নিজের বুকের উপর চেপে ধ'রে ব'ললে—"আমার সন্ধ্যামণি!"

* * * * * *
* * *

ভুবনবাবু এলেন। তাঁর ছেলেকে ফিরে পাওয়ার সমস্ত সাধনাই যে এই সন্ন্যাসিনী মেয়েটি করেচে তা' বুঝলেন। কাজলকে বুকের কাছে টেনে ব'ললেন, "মা, আমার প্রদীপের

জন্যেই তোমার সৃষ্টি। বুঝি আলোকের পরপারে—অন্ধকারের গর্ভে—যখন তোমাদের জন্মরহস্য লুকানো ছিল, তখন থেকে ও তোমায় ভালবাসে।”

৩০

বিজলী ক'লকাতায় এল। কাজলের এবার মনের মত বর হয়েছে—এ আনন্দ তাকে স্থির থাকতে দিলে না। তার আর দেরী সয় না।—কোনমতে ছুইহাতে এক হ'য়ে গেলে হয়—। মেঘনাদকে ব'ললে, "বাবা, এই অগ্রাণেই বিয়ে দিয়ে দাও—আর দেরী ক'রো না, মাঘমাস অবধি অপেক্ষা ক'রতে গেলে আবার কি বাধা এসে প'ড়বে। একেই তো আমার ছোট ননদের বিয়ে সে সময়—। কাজুর বিয়েটায় ভাল ক'রে মজা না ক'রলে চ'লবে কেন?—"

মেঘনাদ ব'ললেন, "কাজল যদি প্রস্তুত হ'য়ে থাকে, আমার আপত্তি কি মা?—"

বিজলী ছুটলো কাজলের কাছে। "কি লো, ফুল ফুটলো—? খুব যা হোক প্রদীপকে পরীক্ষা ক'রে নিলি, ভাই!"

ম্লান হাসি হেসে কাজল ব'ললে, "তবু ত আমার পরীক্ষার শেষ হ'ল না, দিদি—"

বিজলী কাজলের গলার স্বরে চম্‌কে উঠলো।

"ওকি কথা কাজল? তবে কি এ বিয়েতে তোর মত নেই?"

"আমার যিনি দেবতা তাঁর আদেশ,—এ বজ্রের চেয়ে কঠিন,—তবু পালন ক'রবো।"

"তোর আবার দেবতা কে ?"

"তাঁকে চোখে দেখতে পাইনে।"

"কোথায় থাকেন ?"

"আমার অন্তরে।"

এবার বিজলী হেসে ফেললে। "বাপ্‌রে বাপ, এই এক কবি মেয়ে—তার জুটবে এক মাথাপাগলা কবি বর—এরা দু'জনে ক'রবে কি ? হ্যাঁরে কাজল, তোর বাড়ীতে হাঁড়ি চ'ড়বে তো ? না কাব্যি ক'রেই কাটাবি ?"

কাজল হাসলে—জমাট মেঘ ভেদ ক'রে হঠাৎ একটু সূর্য্য-কিরণ বেরিয়ে প'ড়লে যেমন দেখায়, এ তেম্‌নি হাসি।

তারপর বিজলীর খুকুকে কোলে ক'রে সে আদর ক'রতে লাগলো।

** ** ** **

বিয়ের দিন এল। একা বিজলীর উৎসাহ সব অভাব মিটিয়ে রাখলো। সানাই বাজলো, অধিবাস এল—উৎসবের কোন অঙ্গ বাকি রইল না।

মেঘনাদের বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে ভুবনবাবু ব'ললেন, "আপনার মেয়েটিকে কেবল একমাসের জন্যে নিয়ে যাবো, বেহাই, —তারপর সে আপনারই কাছে থাকবে। প্রদীপকেও এখানে একটা ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দেবেন।"

শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কাজলের মন ভ'রে উঠলো ;—নইলে বাবাকে জন্মের মত ছেড়ে যাওয়া, তার আরো একটা বিষম পরীক্ষা বাকি ছিল।

রাত্রি নটায় লগ্ন। দুপুরের দিকে বিজলী কাজলের শুকনো মুখের পানে তাকিয়ে ব'ললে, "যা না কাজু, একটু শুয়ে থাক্, এর পর তো অনেকক্ষণ ব'সে থাকতে হবে।"

কাজল তো তাই চায়—সকলের দৃষ্টির অন্তরালে সে একটু একা থাকতে চায়। তার বাইরেটা যতই কঠিন হোক—তার ভিতরের কান্না যে এখনো থামেনি।

সে মিহিরের পরিত্যক্ত ঘরটিতে গিয়ে শুয়ে প'ড়লো। রোদের তেজ ছিল না—বাগানের দিকে খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে একটা দম্‌কা হাওয়া আসছিলো—সে চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

ক্রমে চোখের পাতা ভিজে উঠলো—বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝ'রে প'ড়লো—বহুদিন পরে কাজল মন খুলে কাঁদতে পারলে।—

হঠাৎ দরজার মৃদু শব্দে কাজল চেয়ে দেখলে—ঘরে এসে ঢুকচে মিহির!

সে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে ক্ষণকাল সভয়ে মিহিরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল, তারপর অস্ফুটস্বরে ব'ললে, "কেন এলে? কেন তুমি আবার এলে?"

মিহির ব'ললে, "বিজলী আমায় খবর দিয়েছিল—"

কাজল আবার ব'ললে, "কিন্তু আমার মন তো এখনো প্রস্তুত হয় নি!"

মিহির কাজলের পাশে ব'সলো—কতদিন পরে আবার তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ব'ললে, "আমি তা জানি, তবু এসেচি কাজল,—কাল আমি আমেরিকা চ'লে যাচ্চি।—যাবার আগে তোমায় একবারটি দেখতে এলুম।"

রুদ্ধস্বরে কাজল ব'ললে, "কাল ?—এত শীগগির ?"

"তাই ত ভাল কাজল, তাই ত ভাল। তুমি সুখী হবে—আমার সর্ব্বান্তঃকরণ ব'লচে তুমি সুখী হবে।"

মিহির উঠে দাঁড়ালো।

কাজল ব্যস্ত হ'য়ে শয্যা থেকে নেমে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে মিহিরকে প্রণাম ক'রলে। মিহির তার মাথায় হাত রাখলে—তাকে নিজের খুব কাছে টেনে নিয়ে কিসের আশায় মুখ নত ক'রলে, তারপর সহসা তাকে বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উৎসব-বাড়ীতে কেউ তাকে আর দেখতে পায় নি।

বাতায়ন

উমা দেবী

—বিরচিত—

— চল্লিশটি চতুর্দ্দশপদী—

ছোট জীবনের, ছোট সুখদুঃখের কথা; সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রত্যক্ষ-দেখা বিচিত্র ছবির সংগ্রহ।

———o———

"তোমার ছবিগুলি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে, তার কারণ ওর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে।...যে জিনিষকে তুমি হৃদয় দিয়ে দেখেছ, এই ছোটো ছোটো কবিতায় তাকেই সহজ ক'রে দেখিয়েছ।...এই ছবির বিষয়গুলি তোমার বানানো পদার্থ নয়, এ-গুলি তোমার আপন-দেখা বিষয়, তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছ"...

—রবীন্দ্রনাথ

"তোমার নিপুণ তুলিকায় সহজে আঁকা এই ছোট ছোট ছবিগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। তোমার ঘরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তুমি দরিদ্র শ্রমিকদের গৃহে, শিশু ও কিশোরীদের নিত্যকার হাসিকান্নায় জীবনের যে লীলা লক্ষ্য করিয়াছ, তাহাই অনুকম্পায় আঁকিয়াছ; আর যে-টুকু চক্ষু দিয়া দেখিবার নহে, মনের নিভৃতে থাকে, তাহা তোমার সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া প্রকাশ করিয়াছ। আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে ভাষার সংযম দেখিয়া আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি।...তোমার সবটুকু বর্ণনার ভিতরে একটা স্পষ্টতা, স্বাভাবিকতা ও সজীবতা আছে।"

—কামিনী রায়

"'বাতায়ন' স্বর্ণপাত্রে চারিটি শুভ্র ও সুগন্ধ অন্ন। মশলা-সুগন্ধি ঘৃতপক্ক কিছু নয়, কিন্তু অতি স্নিগ্ধ, স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তি-দায়ক। কবিতাগুলির অধিকাংশই অতিশয় সরল স্বাভাবিক অনুভূতি এবং তাহারই উপযুক্ত চেষ্টা-লেশহীন প্রকাশ-সাফল্যে সার্থক হইয়াছে।...অনাড়ম্বর অতি-পরিচিত হেলাফেলার বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করিবার ক্ষমতা যাহার উপর নির্ভর করে, সেই দেখিবার প্রাণশক্তি ও দেখাইবার রচনাশক্তি লেখিকার বিশেষভাবে আছে।...'বাতায়নের' কবিতায় নারীচিত্তের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইয়াছি।...এই হিসাবে কাব্যখানিতে একটা সাহিত্যিক সত্যের পরিচয় আছে।" —মোহিতলাল মজুমদার

"এক একটি কবিতা যেন এক একটি করুণ ছোট গল্প, পড়া শেষ হইয়া গেলেও মনে হয়, তার পর, তার পর। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই, শব্দের ঘটা নাই, ছন্দমিলের আড়ম্বর নাই, তবুও এই চতুর্দ্দশপদীগুলির শান্ত সমাহিত শ্রী মনকে মুগ্ধ করে... লেখিকার করুণাকোমল দৃষ্টি এবং সরল কৌতূহলের ভিতর দিয়া দেখা দিয়াছে বলিয়াই সেগুলি আমাদের প্রাণকে এমন ভাবে স্পর্শ করে।" —"প্রবাসী"

"হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বেদনার সচ্ছন্দ অভিব্যক্তিই হচ্ছে 'বাতায়ন' কাব্যের বিশেষত্ব; যা কেবল 'মর্ম্মমাঝে থাকে সঙ্গোপনে' তাকে এমন বুক দিয়ে অনুভব ক'রে এমন সহজ কথায় নিবিড় ভাবে প্রকাশ ক'রতে বাংলা সাহিত্যে আর কাউকে দেখিনি।" —"ভারতবর্ষ"

"কোথাও কুয়াসায় অস্পষ্ট অথবা ভাবাবেগের বাষ্পে আচ্ছন্ন নয়, বরং বর্ণনার সহজ অকুণ্ঠ ভঙ্গিমায় এবং 'প্রকাশের সরল নৈপুণ্যে' স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল। প্রত্যেকটি কবিতা চোখের সম্মুখে একটি ছবিকে ফুটাইয়া তোলে এবং মনের মধ্যে একটি অনুভূতিকে জাগাইয়া দেয়। বাঙ্‌লা ভাষায় এই ধরণের কবিতা খুব বেশী নাই।"

—"নবশক্তি"

"গতানুগতিক কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে সহসা এই কবিতাগুলি একটি বিশেষভাবে চিত্তকে আবেদন করে। জীবনের ছোটখাটো ঘটনা, যাহা রাজসমারোহের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তাহা নারীর কল্যাণদৃষ্টিতে এক অপরূপ মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

—"মোহাম্মদী"

"Uma Devi's poetical inspiration as well as its expression have a freshness rare to find in these days in Bengali poetry...She has looked out of her window...and all these familiar matters of our humble working days, with the play of her feelings upon them, have produced these cameos of sympathy and observation and colour.

—"Modern Review"

"Their easy flow and simplicity of expression have endowed them with a grace mellowed by a sweet sincerity of tune, so rare in modern Bengali poetry."

—"Advance"

"These poems have in them the sympathy, the simplicity and the flawless form that go with real poetry. The canvas is small, but the lines, though few, are distinct, the paint never too thick, and the picture—for these are a series of vivid pen-pictures—is complete."

—"Amrita Bazar Patrika"

"Sketches of little commonplace objects we see around with not a single redundant line of the pencil—vivid with the reality of life invested with deep pathos."...... —"Bengalee"

—o—

=অভিনব মুদ্রণ, অনাড়ম্বর শোভন রূপ=

"A volume of poems elegantly dressed"

—"Modern Review"

"এত সুন্দর কাগজে এত পরিষ্কার ও রুচিসঙ্গতভাবে মুদ্রিত পুস্তক খুব কম আছে।" —"মোহাম্মদী"

"Will please the most fastidious of bibliophils"

—"A. B. Patrika"

—o—

মূল্য এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত

৫৫ নং কেনাল ঈস্ট্ রোড, বেলেঘাটা,

কলিকাতা।

—প্রাপ্তিস্থান—

এম সি সরকার এণ্ড সন্স

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

বুক কোম্পানী

৪-৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ডি এম লাইব্রেরী

৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ঘুমের আগে

উমা দেবী

—বিরচিত—

অপূর্ব্ব শিশুচিত্তহারী কবিতা, গাথা ও ছড়ার
সচিত্র সংগ্রহ

—"গল্প শোনা"—

—"খোকার জগৎ"—

—"ঘুমপাড়ানি গান"—

"ঘুমের আগে গল্প শুনে
চোখ্‌টি বুজে আসে,
ঘুমের ঘোরে গল্প যেন
স্বপন-মাঝে ভাসে"

—o—

দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য আট আনা মাত্র
প্রকাশক—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা